দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৬ বর্ষ, ২৬ সংখ্যা।। ১৮ মার্চ, ২০২৪
৪ চৈত্র, ১৪৩০।। যুগাব্দ - ৫১২৫
website : www.eswastika.com

আগামী নির্বাচন ও
নাগরিক কর্তব্য
— পৃঃ ১১

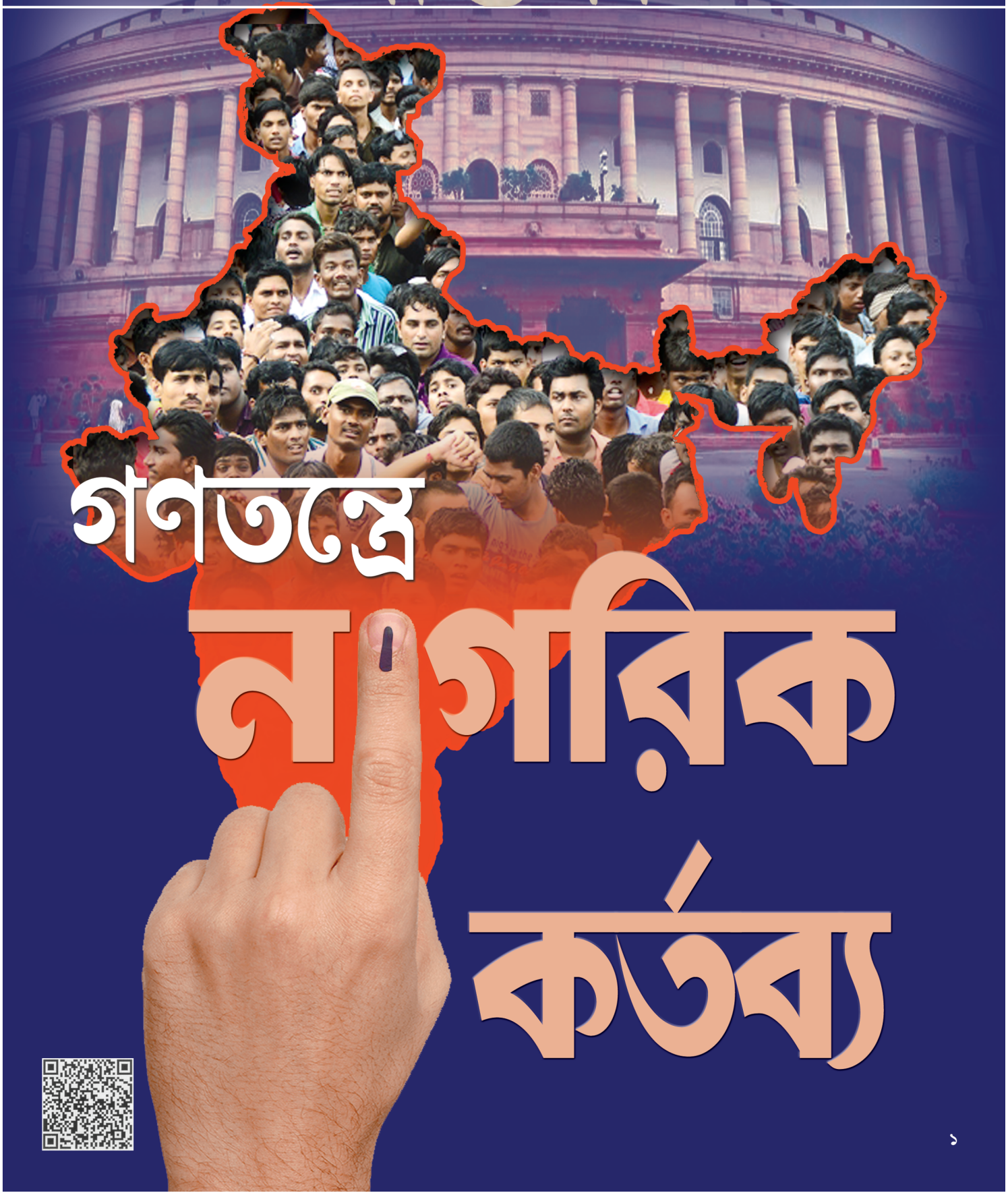

গণতন্ত্রে নাগরিক কর্তব্য

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE NEW AGE PANELS

SAINIK PLYWOOD HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৬ বর্ষ ২৬ সংখ্যা, ৪ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

১৮ মার্চ - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

বিরলতাই ব্যক্তির পরিচয় 'তোমার পতাকা যারে দাও...' ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

ক্যা ক্যা ছিঃ ছিঃ ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

দ্রুততার সঙ্গে বেড়ে চলেছে ভারতীয় অর্থব্যবস্থার আকার ◻ প্রহ্লাদ সবনানী ◻ ৮

বায়ুসেনা পাচ্ছে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমান ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

আগামী নির্বাচন ও নাগরিক কর্তব্য ◻ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী ◻ ১১

শত ষড়যন্ত্রের নাগপাশ ছিন্ন করে দেশনায়ক সুভাষচন্দ্রকে যথাযোগ্য মর্যাদায় ভূষিত করেছে বর্তমান কেন্দ্র সরকার ◻ ড. পঙ্কজ কুমার রায় ◻ ১৪

আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপ ◻ ড. পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায় ◻ ১৭

পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা ও অর্থীতির ভরাডুবির জন্য বামফ্রন্ট ও তৃণমূল সরকার দায়ী ◻ আনন্দ মোহন দাস ◻ ১৯

মোদী সরকারের নেতৃত্বে ভারতের প্রতিরক্ষা শক্তি বৃদ্ধি ◻ কর্নেল ড. কুণাল ভট্টাচার্য ◻ ২৩

মোদী সরকারের নারী ক্ষমতায়ন, নারী সুরক্ষা, মহিলা সংরক্ষণ আইন ◻ দেবযানী ভট্টাচার্য ◻ ২৬

প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি এবং ন্যাশনাল লজিসটিক্স পলিসি দেশের ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রকে আন্তর্জাতিক মানে নিয়ে যাবে ◻ সুদীপ্ত গুহ ◻ ২৯

দেশপ্রেমের মূর্ত প্রতীক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ◻ ড. তন্ময় দাস ◻ ৩১

ইসলামি যুগে দিল্লি সম্রাট হিন্দুবীর হিমু ◻ অমলেশ মিশ্র ◻ ৩৩

মোদী সরকার কৃষক ও গরিবের প্রকৃত বন্ধু ◻ কল্যাণ গৌতম ◻ ৩৫

জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে বসানোর রায় দিন ◻ রামব্রহ্ম দেবশর্মা ◻ ৪৩

ভারতবিরোধীদের বিপক্ষেই ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে হবে ◻ প্রতীক মুখার্জ্জী ◻ ৪৪

বিচারধারা প্রতিষ্ঠার দশ বছর ◻ ড. জিষ্ণু বসু ◻ ৪৬

আসন্ন লোকমত নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গবাসীর কর্তব্য ◻ ড. রামানুজ গোস্বামী ◻ ৪৮

নিয়মিত বিভাগ :

অঙ্গনা : ২২ ◻ রঙ্গম : ৩৯ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৯-৫০

প্রকাশিত হবে
২৫ মার্চ,
২০২৪

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২৫ মার্চ,
২০২৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

ভারতীয় জীবনে দোল

ভারতীয় জীবনে দোল একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। রঙের খেলার সবাই মেতে ওঠে। প্রকৃতিও এই সময় বিচিত্র সাজে সেজে ওঠে। বঙ্গজীবনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবে এই উৎসবের গুরুত্ব এক অন্য মাত্রা পেয়েছে। রঙের এই উৎসবে মানুষ একে অন্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ে। একের সঙ্গে অন্যের মিলনের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয় সাহিত্য।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যা সাহিত্য সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হবে। লিখবেন কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**

Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

একটি পবিত্র কর্তব্য

ভারত বিশ্বের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ। এই দেশের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকরা তাহাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করিয়া যোগ্য দলের যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচিত করিয়া দেশ শাসনের দায়িত্ব অর্পণ করিয়া থাকেন। ভারতীয় ভোটাররা বরাবরই স্থায়ী সরকার গঠনের লক্ষ্যে ভোট প্রদান করিয়া থাকেন। কখনো কখনো মিলিজুলি দলের সরকারও হইয়াছে, কিন্তু তাহা স্থায়ী হইতে পারে নাই। স্থায়ী হইলেও বিপরীতমুখী দলের স্বার্থের টানাপোড়েনে দেশের উন্নয়নে বিঘ্ন ঘটিয়াছে। স্বাধীনতার পর একটিমাত্র দলের সরকার কয়েক দশক স্থায়ী হইলেও দেশ গঠনে তাহাদের ইতিবাচক ভূমিকা পরিলক্ষিত হয় নাই। পারিবারিক স্বার্থসিদ্ধি, স্বজনপোষণ এবং দুর্নীতিতে তাহারা নিমজ্জিত হইয়াছিল। বিশ্বের দরবারে দেশ তখন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখিতে পারে নাই। সময় অতিবাহিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় গণতন্ত্র সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, ভোটাররাও সচেতন হইয়াছেন। বিগত দুইটি লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় ভোটাররা একটি রাষ্ট্রবাদী দলকে স্থায়ীভাবে দেশ শাসনের দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে। দেশবাসীও তাহার সুফল পাইতে শুরু করিয়াছে। ৩৭০ ধারা বাতিল করিয়া কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদ সমাপ্ত করিয়াছে, মুসলমান মহিলাদের অভিশপ্ত তিন তালাক বাতিল করিয়াছে, অযোধ্যায় শ্রীরামমন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করিয়াছে, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বলবৎ করিয়াছে। রাষ্ট্রবাদী সরকারের নেতৃত্বে দেশ সর্বদিক হইতে উন্নতির পথে চলিতেছে। একই সঙ্গে পররাষ্ট্রনীতিতেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করিয়া বিশ্বনেতৃত্বের স্থান লাভ করিয়াছে। দেশে সাধারণ নাগরিকের জীবনযাত্রার মানের যেইরূপ বৃদ্ধি ঘটিয়াছে, বিদেশেও ভারতের সম্মান ততোধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা ভারতীয় ভোটারদিগের রাষ্ট্র সচেতনতারই লক্ষণ।

এতদ্‌সত্ত্বেও দেশের অভ্যন্তরে বিভেদকামী শক্তি এবং বিদেশে ভারতবিরোধী শক্তি দেশকে দুর্বল করিবার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে। ভারতের এই নবোত্থান তাহারা মানিয়া লইতে পারিতেছে না। দুর্ভাগ্যের হইল, দেশেরই কিছু রাজনৈতিক দল এবং তাহাদের উচ্ছিষ্টভোগী তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতা করিতে করিতে রাষ্ট্র বিরোধিতা করিতে শুরু করিয়াছে। অহরহ তাহারা ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির অপমান করিয়া চলিয়াছে। অযোধ্যায় শ্রীরামমন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় যখন সমগ্র বিশ্ব উদ্বেল, তখনো তাহারা তাহার বিরোধিতা করিয়া নিজেদের রাষ্ট্রবিরোধী প্রমাণ করিয়াছে। দেশের প্রকৃত রাষ্ট্রবাদী ও স্থায়ী সরকারকে শাসনক্ষমতা হইতে উৎখাতের লক্ষ্যে জোটও নির্মাণ করিয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয়, সেই জোট অবশ্য অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে, তাহাতে কিন্তু তাহাদের রাষ্ট্র বিরোধিতার মাত্রা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই।

সেই কারণেই আসন্ন অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে আরও সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। ভোট দানের মাধ্যমে আইনপ্রণেতা নির্বাচিত করিয়া কিছু সুযোগসুবিধা প্রাপ্ত হইবার অধিকারী হইলেও ভোটদান প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের পবিত্র কর্তব্যও বটে। দেশের স্থায়ী উন্নয়নযজ্ঞে আহুতি প্রদান অর্থাৎ সহভাগী হইবার মতোই ইহা একটি পবিত্র কর্ম। লক্ষ্য করা গিয়াছে, শহরাঞ্চলে তথাকথিত শিক্ষিত ভোটাররা ভোটদানে বিরত থাকিয়াও সরকারের সমালোচনায় মুখর হন। ইহা সুস্থ গণতন্ত্রের লক্ষণ নহে। সরকার গঠনে তাহাদের তো অংশীদারিত্বই নাই। ভোটদানে বিরত থাকা অথবা নোটায় ভোট দান উভয়ই সুস্থ মানসিকতার পরিচায়ক নহে। ইহাতে রাষ্ট্র বিরোধী দলকেই উৎসাহিত করা হয়। মনে রাখিতে হইবে, লোকসভার নির্বাচন সমগ্র দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করিবার মাধ্যম। দেশকে উন্নতি ও অগ্রগতির পথে লইয়া যাইবার মাধ্যম। পশ্চিমবঙ্গবাসীকে এই বিষয়ে আরও সচেতন থাকিতে হইবে। কেননা, এই রাজ্যে নৈরাজ্যের শাসন চলিতেছে। শাসকের মদতে এই রাজ্যে মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা কায়েম হইয়াছে। নারীজাতির সম্মান ভূলুণ্ঠিত হইয়াছে। নারীজাতির সম্মান রক্ষা না করিয়া রাজ্যের শাসক নরপশুদের রক্ষার্থে দাঁড়াইয়াছে। তাই আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে দেশবিরোধী, রাষ্ট্রবিরোধী সমস্ত শক্তিকে পরাভূত করিবার লক্ষ্যেই নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহা শুধুমাত্র অধিকার না ভাবিয়া একটি পবিত্র কর্তব্য মনে করিতে হইবে। এই পবিত্র কর্তব্যের মাধ্যমেই দেশ বিশ্বগুরু হইবার পথে আরও একটি সোপান অতিক্রম করিতে পারিবে।

সুভাষিতম্

পূর্বজন্মকৃতং কর্ম তদ্দৈবমিতি কথ্যতে।
তস্মাৎ পুরুষকারেণ যত্নং কুর্যাদতন্দ্রিতঃ।। (হিতোপদেশ)

পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফলকেই ভাগ্য বলা হয়ে থাকে। সেজন্য মানুষকে আলস্য ত্যাগ করে উদ্যোগী হতে হবে।

বিরলতাই ব্যক্তির পরিচয়

‘তোমার পতাকা যারে দাও...’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

লোকসভা ভোটে প্রার্থী বাছাই বুঝিয়ে দিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে মহিলা ও সংখ্যালঘু ভোট সরছে। রাজ্যে আনুমানিক ৪৯ শতাংশ মহিলা ও ৩৪ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোট। তার মধ্যে ৫০ শতাংশ মহিলা এবং প্রায় ৭৫ শতাংশ মুসলমান ভোট মমতার সঙ্গে। মমতা এবার ১২ শতাংশ (১৭ থেকে ১২) কম মহিলা প্রার্থী দিয়েছেন। বর্তমানে তৃণমূলের মহিলা প্রার্থী ২৮ শতাংশ আর মুসলমান প্রার্থী ৭ শতাংশ।

অবসর নিয়ে রাজনীতিতে এলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। কেউ বলছেন আরও ধৈর্য ধরা উচিত ছিল। অল্প বুদ্ধির বিরোধীরা তাঁকে ছদ্মবেশী বলছেন। বুদ্ধিমান বোকারা এভাবেই বিচার করে। রাজ্যের রাজনৈতিক ছবিঘরে তিনি মৌতাত ধরিয়েছেন। হুলুস্থুল ফেলেছেন। রাজনীতি এখন মাফিয়া শাহজাহান শেখ আর চুরিতে অভিযুক্ত পার্থ, অনুব্রত ও জ্যোতিপ্রিয়দের জায়গা। তাঁর মতো চেতনাসম্পন্ন মানুষ কী করবেন? অভিজিৎবাবু সঠিক বুঝেছেন নোংরা জলে চিরকাল থাকা যায় না,তাই তিনি নোংরা সরাতে নেমেছেন। মূর্খ শাসক ভাবতেই পারে বাইরের শক্তি তাঁকে প্রভাবিত করেছে। মূর্খামির সুবিধা হলো কোনো দায়িত্ব নিতে হয় না।

তেরো বছর ধরে মমতা তাঁর নিজের ও শাগরেদদের কোনো অন্যায় দেখেননি। ভাঁড়ামি ও লজ্জাহীতার সীমা তৃণমূল অনেকদিন আগেই ছাড়িয়ে গিয়েছে। কর্মরত বিচারকদের রাজনীতিতে প্রবেশ বিরল নয়। তফাত কেবল বিচারপতির শিরদাঁড়ায়। অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশে থেকেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিজিৎবাবুর ভূমিকা সেই ঋজু শিরদাঁড়ার পরিচায়ক। দুর্নীতির দুর্গন্ধে রাজ্য যখন ভরে উঠেছে, তা থেকে পালিয়ে না গিয়ে তাঁর রাজনীতিতে স্বেচ্ছা প্রবেশ অনন্য। মহাভারতকার বলেছিলেন পাপের ঘর বড়ো হলে অধর্ম ধর্মের রূপ নেয়। মুখ্যমন্ত্রী অভিজিৎবাবুকে সুবিধাবাদী বলেছেন। এই দাবিটা তাঁর মানায় না।

নরসিংহ রাও জমানায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় প্রথমবার স্থান পাওয়ার পর মমতা রাজনৈতিক সুবিধাবাদের এক নতুন সংজ্ঞা দিয়েছেন। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের পাশাপাশি তিনি একমাত্র নেত্রী যাঁকে ‘পালটু রানি’ বলা যেতে পারে। সর্বভারতীয় দুই দল বিজেপি ও জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে তিনি যেভাবে ঘর পালটাপালটির খেলা খেলেছেন তাতে তাঁকে অনায়াসে ‘হাওয়া মোরগ’ বলা চলে। অনেকে তাঁকে দায়িত্বজ্ঞাহীন বলেন। চারবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েও কখনও মেয়াদ পূর্ণ করেননি। তবুও বিদেশি বামেদের বিরুদ্ধে মমতার লড়াইকে সম্মান দেন অভিজিৎবাবু আর এখানেই তিনি অনন্য। মমতা সেই সম্মান পাওয়ার যোগ্য কি না তা নিয়ে আমার প্রশ্ন রয়েছে। তাঁকে সুবিধাবাদী বলায় সাধারণের চোখে মমতারই সম্মানহানি হয়েছে বলেই আমার ধারণা।

ন্যাবা ধরা চোখ সারা দুনিয়াকে ন্যাবা দেখে। অভিজিৎবাবুর রাজনীতিতে প্রবেশ ন্যাবাদের ভিতর নাড়া ফেলেছে।

মানুষ মনে করছেন, বিজেপি তমলুক কেন্দ্রে তাঁকে দাঁড় করাবে। আর তমলুকে তৃণমূলের এক ‘দুধের শিশু’-কে প্রার্থী করে মমতা হয়তো তাঁকে অবজ্ঞা করতে চেয়েছেন। রাজনৈতিক শত্রুকে সম্মান দিতে পারার মধ্যে যে রুচি থাকা প্রয়োজন শাসক হিসেবে নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে মমতা তা অনেকদিন আগেই খুইয়ে ফেলেছেন। মনে হয় রাজীব গান্ধী, অটলবিহারী বাজপেয়ী ও লালকৃষ্ণ আদবাণী তখন বুঝতে পারেননি যে মমতা সততার ভেক ধরে আছেন। ক্ষমতায় আসার পর সেই মুখোশ খুলে পড়ে। সাধারণ রাজনীতির জগতে অভিজিৎবাবুর মতো স্পষ্টবাদী আর নির্ভীক ব্যক্তি বড়ো একটা চোখে পড়ে না।

অনেকেই আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য পাগলামি করেন। দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অভিজিৎবাবু মানুষের কাছে চিহ্ন রেখেছেন। আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যও যদি তা হয় তাও সই। ন্যাবা ধরা চোখ সারা দুনিয়াকে ন্যাবা দেখে। অভিজিৎবাবুর প্রবেশ ন্যাবাদের ভিতর নাড়া ফেলেছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ধর্ম প্রতিষ্ঠার পতাকা তিনি হাতে নিয়েছেন, তাই সেই পতাকা বহন করার শক্তি তাঁকেই সংগঠিত করতে হবে। সূর্যোদয়ের ভোরেও তাঁকে কুয়াশা থেকে সাবধান থাকতে হবে।

ক্যা ক্যা ছিঃ ছিঃ

ভুলবোঝানেষু দিদি,

আমার সেই দিনটার কথা মনে পড়ছে। বছর চারেক আগের কথা। কলকাতার কোথাও একটা সমাবেশ করেছিলেন। মনে পড়েছে। পার্ক সার্কাস এলাকায়। মানুষকে খেপাতে আপনি সেখানে সিএএ বিরোধী সভা করেছিলেন। পাশে বিখ্যাত সব মানুষেরা ছিলেন। তাঁরা কেউ কবি, কেউ ছবি আঁকিয়ে, কেউ-বা ভাষাবিদ। তাঁদের সবাইকে নিয়ে আপনি 'ক্যা ক্যা ছিঃ ছিঃ' ধ্বনি তুলেছিলেন। নিশ্চয়ই মনে পড়েছে।

এখন দেশজুড়ে যখন সিএএ কার্যকরের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়ে গিয়েছে তখন আপনার পাশে দাঁড়িয়ে 'ক্যা ক্যা ছিঃ ছিঃ' ধ্বনি তোলার কেউ নেই। সন্দেশখালিকাণ্ডের পরে আপনার পোষ মানানো বিশিষ্টেরা মুখের দরজায় ছিটকিনি এঁটে দিয়েছেন। আসলে মুখ খুললে যা বলতে হবে সেটা আপনার পছন্দ হবে না। তাই তাঁরা বলছেন, 'সব কিছু নিয়ে আমাদের কথা বলতে হবে নাকি!'

সে বেশ দিদি। আপনি অবশ্য সিএএ বিজ্ঞপ্তি জারির আগেই সাংবাদিক বৈঠক করে অসত্য প্রচার করেছেন। আপনার অনুগত ভাই হয়েও এ কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি। আমি যা বুঝেছি সিএএ মানে সিএএ-র মাধ্যমে কারও নাগরিকত্ব কাড়া হবে না। এটা নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য। ২০১৯ সালে দ্বিতীয়বার নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে এই আইন প্রণয়নের কাজ শুরু হয়। তার বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার পরে আপনি যা বলছেন তা নয়। তাই দিদি আপনাকে পরামর্শ, নাগরিকত্ব নিয়ে কাউকে ভুল বোঝানো ঠিক হবে না। বরং, সকলে যাতে নাগরিকত্ব পান সে ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে। একটা কথা মনে রাখতে হবে কারও নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার জন্য এই আইন নয়। উদ্বাস্তু হয়ে আসা মানুষদের নাগরিকত্ব দেওয়ার উদ্যোগ।

আপনি আজ বিরোধিতা করছেন। কিন্তু দিদি, বাংলাদেশ থেকে সব খুইয়ে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেওয়া হিন্দু পরিবারগুলির কী দোষ বলুন তো? আপনার পুলিশই তো পাসপোর্ট বানানোর সময়ে মতুয়া সমাজের সদস্যদের থেকে ১৯৭১ সালের আগের জমির দলিল চায়! আজ থেকে ১০০ বছর পরে কেউ প্রশ্ন তুলবেন কি না কথা দিতে পারবেন দিদি? আজ উদ্বাস্তু পরিবারের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নাগরিকত্বের নিশ্চয়তার গ্যারান্টি দিল মোদী সরকার। দোহাই আপনার, সাংবিধানিক পদে বসে দয়া করে ভুল প্রচার করবেন না। এতে ভোট বাড়তে পারে আপনার, কিন্তু ইতিহাস আপনাকে ক্ষমা করবে না।

অবশ্য ইতিহাস তো আপনিই রচনা করেন। লোকসভা নির্বাচনের যে প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করেছেন তার মধ্যে তিনজন বিজেপির বিধায়ক। কোনও কালে কোথাও হয়েছে কি না কে জানে? রায়গঞ্জ থেকে কৃষ্ণ কল্যাণী, বনগাঁ থেকে বিশ্বজিৎ দাস ও রানাঘাট থেকে মুকুটমণি অধিকারীকে প্রার্থী করেছেন আপনি। এঁরা তিনজনেই গত বিধানসভা ভোটে বিজেপির প্রতীকে নির্বাচিত হয়েছিলেন, পরে দল বদলেছে। সম্প্রতি বিধায়ক-পদে ইস্তফা দিয়ে তাপস রায় যেমন তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে গিয়েছেন, অন্য দল থেকে তৃণমূলে আসার সময়ে গত কয়েক বছরে প্রায় কোনও বিধায়কই সেই নীতি অনুসরণ করেননি। দলত্যাগ-বিরোধী আইনে বিধায়ক-পদ খারিজের দাবি জানানো হলেও শুনানিতে কোনও ফয়সালা হয়নি। পিএসি চেয়ারম্যান পদে কেন 'দলবদলু' কৃষ্ণকে বসানো হলো, সেই প্রশ্ন তুলে আদালতেও গিয়েছিল বিজেপি। এখন 'দলবদলু' তিন বিধায়ক তৃণমূলের প্রার্থী! তাঁদের মধ্যে দু'জন তো সিএএ-র সমর্থনে কথা বলেই মতুয়া প্রধান এলাকায় ভোটে জিতেছিলেন! তাঁরা এখন কী বলবেন?

দল বদল করেও বিধানসভার খাতায় তাঁরা রয়ে গিয়েছিলেন পুরনো দলে। বিরোধী দলের বিধায়ক পরিচয়েই তাঁদের মধ্যে একজন আবার বিধানসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির (পিএসি) চেয়ারম্যান। এবার আপনার দল তাঁদের লোকসভা ভোটে প্রার্থী করে দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত বিধায়ক-পদ ছাড়তে হবে তিন জনকেই। দলত্যাগ- বিরোধী আইন প্রয়োগ আটকাতে যে পরিচয়ের 'ঢাল' কাজে লাগানো হয়েছিল, তৃণমূল কংগ্রেসের নিজেদের সিদ্ধান্তেই তা খসে যাবে। স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকাকেও কুর্নিশ করতে হয়। স্পিকার বিমানের অবশ্য ব্যাখ্যা, 'স্পিকার হিসেবে বিধায়কদের যে পরিচিতি বিধানসভায় রয়েছে, তার ভিত্তিতেই গোটা বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। বাইরে কে, কোথায় কী করছেন, তা দেখা আমার কাজ নয়। ফলে, দলবদলের যে অভিযোগ রয়েছে, তা বিধানসভার নিয়ম-বিধির ভিত্তিতেই দেখা হবে।' আহা। কী সুন্দর মন্তব্য! □

দেশজুড়ে যখন সিএএ কার্যকরের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়ে গিয়েছে তখন আপনার পাশে দাঁড়িয়ে 'ক্যা ক্যা ছিঃ ছিঃ' ধ্বনি তোলার কেউ নেই। সন্দেশখালিকাণ্ডের পরে আপনার পোষ মানানো বিশিষ্টেরা মুখের দরজায় ছিটকিনি এঁটে দিয়েছেন।

অতিথি কলম

প্রহ্লাদ সবনানী

দ্রুততার সঙ্গে বেড়ে চলেছে ভারতীয় অর্থব্যবস্থার আকার

বিশ্বের বহু অর্থনৈতিক সংস্থার মত হলো ২০২৭-এর মধ্যে ভারত হয়ে উঠতে পারে বিশ্বের তৃতীয় সর্ববৃহৎ অর্থনীতি।

বর্তমান সময়কালে ভারতীয় অর্থব্যবস্থা প্রতি বছর প্রায় ৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। অর্থব্যবস্থার আকারে বিস্তার ঘটলে সেই দেশের নাগরিকদের আয় বৃদ্ধি পায়, এর ফলে গরিব শ্রেণীর কাছেও অর্থ আসে, বিভিন্ন জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়ে, উপার্জনেরও নতুন পথ খুলে যায় এবং সর্বোপরি নিম্নবিত্তদের সংখ্যা কমে মধ্যবিত্তদের সংখ্যাধিক্য ঘটে। নীতি আয়োগের এক প্রতিবেদন অনুসারে ২০১৫-'১৬ সালে ভারতের শহরাঞ্চলে দরিদ্র শ্রেণীর সংখ্যা ২৪.৮৫ শতাংশ ছিল যা ২০২০-'২১ সালে কমে ১৪.৯০ শতাংশে পৌঁছায়। এর মধ্যে ৯.৯৫ শতাংশ দারিদ্র্য হ্রাস প্রাপ্তির হার নির্ধারিত হয়। একই ভাবে ২০১৫-'১৬ সাল নাগাদ ভারতের গ্রামীণ অঞ্চলে দরিদ্র শ্রেণীর সংখ্যা ছিল ৩২.৫৯ শতাংশ, যা ২০২০-'২১ সালে কমে ১৯.২৮ শতাংশে নেমে আসে। যেহেতু ভারতে দরিদ্র শ্রেণীর সংখ্যা অনেকাংশে কমেছে, এই কারণে বৈশ্বিক রেটিং সংস্থান ভারতের রেটিঙের বৃদ্ধি দেখিয়ে চলেছে। স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুয়োস্ গ্লোবাল রেটিং সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২৩-'২৪ আর্থিক বর্ষে ভারতের উন্নয়ন হার দাঁড়াবে ৬ শতাংশ এবং ২০২৪-'২৫-এ তা ৬.৯ শতাংশ হওয়ার সম্ভাবনার কথাও এই রিপোর্টে উল্লেখিত হয়েছে। তার সঙ্গে এই সংস্থার মতে ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতীয় অর্থনীতি ৭ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি মার্কিন ডলারে পৌঁছে যাবে। ২০২৩ সালে ২৬ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলারের আমেরিকান অর্থনীতি বিশ্বের প্রথম স্থানে রয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে চীন। তাদের অর্থনীতি ১৮ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলারের। তৃতীয় স্থানে রয়েছে জাপান, তাদের অর্থনীতি ৪ লক্ষ ২০ হাজার কোটি মার্কিন ডলারের। চতুর্থ স্থানে জার্মানি, তাদের অর্থনীতি প্রায় ৪ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলারের। ক্রমবর্ধমান ভারতীয় অর্থনীতির প্রতি বছর ৭ শতাংশ উন্নয়ন হারের দরুন খুব শীঘ্রই জাপান ও জার্মানিকে পিছনে ফেলে বিশ্বের তৃতীয় সর্ববৃহৎ অর্থব্যবস্থা হতে চলেছে ভারত। ফিচ নামক রেটিং সংস্থাও ভারতীয় অর্থব্যবস্থার উন্নতির হারের পূর্বানুমান পরিবর্তন করে ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে ভারতের উন্নয়ন হার ৬.২ শতাংশে দাঁড়াবে বলে ঘোষণা করেছে। প্রথমে তারা ৫.৫ শতাংশ হতে পারে বলে অনুমান করেছিল। মুডিজ নামক রেটিং সংস্থাও ২০২৩-'২৪ আর্থিক বছরে ভারতের উন্নতির হার ৬.৭ শতাংশে দাঁড়ানোর সম্ভাবনার কথা প্রকাশ করেছে। ভারত দ্রুততার সঙ্গে উন্নতি ঘটাচ্ছে, ভারতীয় অর্থনীতি দ্রুত বিস্তারলাভ করছে, উৎসব-অনুষ্ঠানের কারণে বাজারে কেনাকাটায় প্রচণ্ড ভিড় থেকে তা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ভারত-২৪ নামক নিউজ চ্যানেলের একটি অনুষ্ঠানে পরিবেশিত তথ্য অনুসারে ভারতের সমস্ত ঘরোয়া উৎপাদনের (অর্থাৎ কৃষি, শিল্প ও সেবা ক্ষেত্রে মোট উৎপাদন) আর্থিক মূল্যায়নের পরিমাণ ২০২২-'২৩ আর্থিক বর্ষে ২৮২.৮৩ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। আমেরিকার সমস্ত ঘরোয়া উৎপাদন প্রথম স্থানে রয়েছে, যা ২১২১.১৯ লক্ষ কোটি টাকার। সেই কারণে আমেরিকা সমগ্র বিশ্বে সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ হিসেবে পরিগণিত। দ্বিতীয় স্থানে চীন, ১৪৯৭.৩১ লক্ষ কোটি টাকার ঘরোয়া উৎপাদন। জাপানের মোট ঘরোয়া উৎপাদন ৪০৭.৬ লক্ষ কোটি টাকার। জার্মানির ঘরোয়া উৎপাদন ৩৪১.০৫ লক্ষ কোটি টাকার। এই দিক থেকে ভারত পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি। ২০১৩-'১৪ আর্থিক বছরে ভারতের মোট ঘরোয়া উৎপাদন ছিল ১১৩.৫৫ লক্ষ কোটি টাকার। সেই অর্থবর্ষে ভারতীয় অর্থব্যবস্থা সমগ্র বিশ্বের মধ্যে দশম স্থানে ছিল। সেই সময় আমেরিকার অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ছিল ১৪৫৯.৮৮ লক্ষ কোটি টাকার, চীনের ছিল ৮৭১.৭৭ লক্ষ কোটি টাকার, জাপানের ৩৪৯.৩৭ লক্ষ কোটি টাকার, জার্মানির ৩২৩.৫৯ লক্ষ কোটি টাকার। আমেরিকার অভ্যন্তরীণ উৎপাদন এর মধ্যে ৫০ শতাংশ, চীনের ৮০ শতাংশ, জাপানের ৩০ শতাংশ এবং জার্মানির ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে ভারতের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ১৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই গতিতে আর্থিক উন্নতি করতে থাকলে নিশ্চিত ভাবে ২০৩০ সালের আগে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থব্যবস্থা হয়ে উঠবে। বিশ্বের বহু অর্থনৈতিক সংস্থার মতে ২০২৭ সালের মধ্যেই ভারত বিশ্বের তৃতীয় সর্ববৃহৎ অর্থনীতি হয়ে উঠতে পারে। এর অর্থ হলো দেশের প্রতিটি ব্যক্তির আয় আরও দ্রুত গতিতে বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। এর সঙ্গে, ভারত আজ প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জন করে চলেছে। আজ ভারতে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সেই সব উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী ব্যবহারের ক্ষেত্রটিরও বিস্তারলাভ ঘটেছে। 'ভোকাল ফর লোকাল'-এর উদ্ঘোষ প্রতিদিন জোরালো হচ্ছে এবং ভারতীয় নাগরিকরা এখন চীনা পণ্যের ব্যবহার কমিয়ে ভারতে উৎপাদিত সামগ্রী ব্যবহারে জোর দিচ্ছে।

'মেক ইন ইন্ডিয়া' পরিকল্পনার অধীনে বহু কাজও হতে দেখা যাচ্ছে এবং ভারতে তৈরি পণ্যের রপ্তানিও ক্রমশ বাড়ছে। ২০১৪ সালে ভারতের ১৯.০৫ লক্ষ কোটি টাকার রপ্তানির তুলনায় ২০২২-'২৩ আর্থিক বছরে ভারত ৩৬ লক্ষ কোটি টাকার সামগ্রী রপ্তানি করে। এই সাম্প্রতিক রপ্তানির পরিমাণ ২০১৪ সাল অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ। ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে ভারত সরকার মূলধনী ব্যয় ১০ লক্ষ কোটি টাকায় নিয়ে গিয়েছে। এর ফলে উপার্জনের নিত্য নতুন সুযোগ তৈরি হয়ে চলেছে। ২০১৪-'১৫ সালে ভারতে ৯৭,০০০ কিলোমিটার জাতীয় সড়ক ছিল, যা ৯ বছর পর ২০২৩-'২৪ সালে বেড়ে ১,৪৫,১৫৫ কিলোমিটারে পৌঁছেছে। এই সময়কালে ৫০,০০০ কিলোমিটার নতুন জাতীয় সড়ক নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এখন তো গুণগত মানে ভারতের জাতীয় সড়ক আমেরিকার জাতীয় সড়কের সঙ্গে পাল্লা দিতে প্রস্তুত। উন্নত জাতীয় সড়ক ব্যবস্থা দেশের প্রগতির জন্য অত্যাবশ্যক। উন্নত মানের জাতীয় সড়কপথ থাকলে ব্যবসাবাণিজ্য ও কর্মসংস্থান দুই-ই বৃদ্ধি পায়।

ভারত বর্তমানে দেশীয় শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর ব্যবহারও ক্রমাগত বাড়াচ্ছে। 'ভোকাল ফর লোকাল'-এর ধ্বনি আরও জোরালো হচ্ছে। ভারতীয় নাগরিকরা এখন চীনে উৎপাদিত, ভারতে আমদানীকৃত দ্রব্যের ব্যবহার কমিয়ে ভারতের ঘরোয়া শিল্পজাত সামগ্রী ব্যবহার করছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও ভারতেরই উৎপাদিত সামগ্রী ব্যবহারের বার্তা দিয়ে সকল ভারতীয় নাগরিকের কাছে বার বার আবেদন জানাচ্ছেন। তাঁর এই আবেদনের ব্যাপক প্রভাব দেশ জুড়ে দেখাও যাচ্ছে। ভারতে বিভিন্ন উৎসবের মরসুমে চীন থেকে পণ্যসামগ্রী আমদানিও অনেকটাই কমেছে। একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, এই বছর চীন থেকে প্রায় এক লক্ষ কোটি টাকার পণ্য আমদানি কমেছে। দীপাবলীতে চীনা লাইট আমদানিও ৩২ শতাংশ কমেছে। অপরদিকে ভারতে তৈরি লাইটের বিক্রি বৃদ্ধি পেয়েছে ৬০ শতাংশ, যাতে গরিব পরিবারগুলি উপকৃত, লাভান্বিত হয়েছে। প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকেরই একটি বিষয় মাথায় রাখা উচিত— রাস্তার ধারে এক কোণে বসে কিছু জিনিসপত্র বিক্রয়কারী গরিব মানুষজনের সঙ্গে বেশি দরাদরি না করে তাদের কাছ থেকে জিনিসপত্র কেনা, যাতে সেই সব গরিব লোকজন তাদের আয় বাড়াতে পারে। সাধারণ মানুষই যখন শপিং মল থেকে কেনাকাটা করে, তখন কি সেখানে তারা সামান্যতমও দরাদরি করে থাকে?

ঘরোয়া বা অভ্যন্তরীণ উৎপাদন সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধি পেলে দেশের মানুষের আয়ও বৃদ্ধি পায়। জনগণের আয় বৃদ্ধি হলে তাদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বাজার থেকে কেনাকাটার পরিমাণও স্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। ফলে বাজারে জিনিসপত্রের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। জিনিসপত্রের চাহিদা এবং সেই চাহিদাপূর্তির সাম্যাবস্থার দ্বারা সেই জিনিসপত্রের মূল্য নির্ধারিত হয়। যখন কোনো জিনিসের চাহিদা তুলনামূলকভাবে দ্রুততার সঙ্গে বাড়তে থাকে, তখন সেই উৎপাদিত সামগ্রী সময়মত বাজারজাত করা না গেলে তার মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। মানুষের খরচ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে সেই ক্ষেত্রে বেশি দাম দিতে দ্বিধা করে না। ভারতে যে কেবল দ্রুত হারে আর্থিক উন্নয়ন হচ্ছে তা নয়, এর সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতিও নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এটি কেন্দ্রীয় সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যৌথ প্রচেষ্টার ফলেই সম্ভব হচ্ছে। ভারতের আর্থিক নীতিসমূহ মূল্যবৃদ্ধি রোধের পাশাপাশি উন্নয়নের ক্ষেত্রেও গতিশক্তি সঞ্চার করে চলেছে। খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যগুলির মূল্যহ্রাসের কারণে ২০২৩-এর অক্টোবর মাসে খুচরো দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির হার কমে বিগত ৪ মাসের সর্বনিম্ন স্তর ৪.৮৭ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, উপভোক্তা মূল্য সূচকাঙ্ক (কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স) আধারিত খুচরো মুদ্রাস্ফীতির হার ২০২৩-এর সেপ্টেম্বরে বিগত তিন মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরে— ৫.০২ শতাংশে ছিল।

ভারতের সাধারণ মানুষের সর্বাধিক খরচ— খাওয়া-দাওয়া ও স্বাস্থ্য পরিষেবাতেই হয়। কেন্দ্রীয় সরকার বাজেটে স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য ৮৯,০০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করেছে। ডাক্তারদের সংখ্যা ৪ লক্ষেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতে বর্তমানে ১৩ লক্ষেরও অধিক অ্যালোপ্যাথি ডাক্তার রয়েছে। এছাড়াও ৫.৬৫ লক্ষ আয়ুর্বেদিক ডাক্তারও রয়েছে। এইভাবে ভারতে ৮৩৪ জন মানুষ প্রতি একজন ডাক্তার রয়েছে। গরীব মানুষের নিঃশুল্ক চিকিৎসার জন্য 'আয়ুষ্মান স্বাস্থ্য কার্ড' প্রদান করা হয়েছে। একই ভাবে, কৃষকদের জন্য মোদী সরকার কুইন্টাল প্রতি গমে ৭৭৫ টাকা এবং চালে ৭৩০ টাকা হতে ন্যূনতম সমর্থন মূল্য (এমএসপি) বৃদ্ধি করে আজ যথাক্রমে ২,২৭৫ টাকা ও ২,১৮৩ টাকা প্রতি কুইন্টাল করেছে। ২০১২-'১৩ অর্থবর্ষে ভারতীয় কৃষকদের গড় মাসিক আয় ছিল ৬,৪২৬ টাকা যা ২০১৮-'১৯ আর্থিক বছরে বেড়ে ১০,২৪৮ টাকা হয়েছে। ইউএনডিপি-র একটি প্রতিবেদনে বলা হয় যে ভারতে মধ্যবিত্তের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আন্তর্জাতিক স্তরে মধ্যবিত্ত মানুষের ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় বা সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভারতের অবদান ২৪ শতাংশ। বিশ্বের বহু অর্থনৈতিক সংস্থার মত হলো ২০২৭-এর মধ্যে ভারত হয়ে উঠতে পারে বিশ্বের তৃতীয় সর্ববৃহৎ অর্থনীতি। তার মানে এটাও দাঁড়ায় যে দেশের প্রতিটি ব্যক্তির আয় আরও দ্রুত গতিতে বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। তার সঙ্গে, ভারত আজ প্রতিটি ক্ষেত্রেই আত্মনির্ভর হয়ে উঠছে।

(লেখক ভারতীয় স্টেট ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার)

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম- ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

শোকসংবাদ

দক্ষিণ কলকাতার বাঘাযতীন শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক ডাঃ মিহিরকান্তি হালদার (ডালু হালদার) গত ৭ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিনী ও পুত্রদের রেখে গেছেন। সত্তরের দশকে তিনি স্বয়ংসেবক হন। শ্রীরামজন্মভূমি মুক্তি আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। নব্বইয়ের দশকে দক্ষিণ কলকাতার ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক হওয়ার সুবাদে বহু মানুষকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করেছেন। নানারকম সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

বায়ুসেনা পাচ্ছে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমান

ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বায়ুসেনার অবদান সুবিশাল। ভারে-বহরে ভারতীয় বায়ুসেনা বিশ্বের মধ্যে চতুর্থ স্থানে রয়েছে করে। গাজিয়াবাদে বায়ুসেনার হিন্দন ঘাঁটি এশিয়ার বৃহত্তম বায়ুসেনা ঘাঁটি হিসেবে পরিগণিত। ভারতের যুদ্ধ বিমানের সংখ্যাও বেশ ভালো, তার মধ্যে আছে সুখোই এসইউ-৩০ এমকেআই, মিগ-২৯, হ্যাল তেজস, মিরাজ-২০০০ যুদ্ধবিমান, জাগুয়ার যুদ্ধবিমান, হ্যাল রুদ্র যুদ্ধবিমানের মতো অত্যাধুনিক ফাইটার জেটগুলি। এরই মাঝে ভারতীয় বায়ুসেনার জন্য এল সুখবর। বায়ুসেনা পেতে চলেছে পঞ্চম প্রজন্মের দেশীয় যুদ্ধবিমান। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে থাকা সংস্থা অ্যারোনটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (এডিএ) তৈরি করছে অ্যাডভান্সড মিডিয়াম কমব্যাট এয়ারক্রাফ্ট (এএমসিএ)। এই যুদ্ধবিমানগুলি পঞ্চম প্রজন্মের এবং ডবল ইঞ্জিনযুক্ত সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি। বিমানগুলির নকশা এমনই করা হয়েছে যে তা খুব সহজে শত্রুর রাডারে চিহ্নিত করতে পারবে না।

ইতিমধ্যেই এই বিমানের ডিজাইন প্রস্তুত। এমতাবস্থায়, প্রকল্পটি অনুমোদনের অপেক্ষায় ছিল। এখন দ্রুত এটির কাজ শুরু হবে এবং এটি দুই বছরের মধ্যে প্রস্তুত হবে বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি এর ফলে বিশ্বের দরবারে দেশের সম্মান এক লপতে অনেকটাই বাড়বে। কারণ চতুর্থ দেশ হিসেবে ভারত আমেরিকা, রাশিয়া ও চীনের পর পঞ্চম প্রজন্মের বিমান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। প্রসঙ্গত, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তির পরিবর্তন ঘটিয়ে বিভিন্ন প্রজন্মের বিমান তৈরি হয়। ১৯৭০-৮০ সালের পর তৈরি যুদ্ধবিমানকে বলা হয় চতুর্থ প্রজন্মের বিমান। ২০০০ সালের শুরুতে নির্মিত বিমানগুলি পঞ্চম প্রজন্মের বিমান। যদি চতুর্থ প্রজন্মের বিমানে নতুন প্রযুক্ত যোগ করে পরিবর্তন করা যায়, তাহলে সেটিকে ৪.৫ প্রজন্ম বলা হয়। ভারতীয় বিমান বাহিনীর কাছে উল্লিখিত চতুর্থ এবং ৪.৫ প্রজন্মের বিমান রয়েছে। এএমসিএ প্রকল্পটি দেশীয় যুদ্ধবিমান ইঞ্জিন প্রোগ্রামের জন্য ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গেও জড়িত। ৪০টি এএমসিএ যুদ্ধবিমানের প্রাথমিক ব্যাচের পাশাপাশি প্রোটোটাইপগুলি জি ই ৪১৪ ইঞ্জিন দ্বারা চালিত হবে। প্রসঙ্গত, পাঠকের স্মরণে থাকতে পারে যে, গত বছরের মাঝামাঝি ভারতের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে যুদ্ধবিমানে ব্যবহৃত আধুনিক জেট ইঞ্জিন এফ-৪১৪ বানাতে চুক্তি করেছিল আমেরিকা। ওয়াশিংটনের তরফে কথা দেওয়া হয়েছিল, এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিও হস্তান্তর করা হবে নয়াদিল্লিকে। জো বাইডেন সরকারের এই প্রস্তাবে সায় দিয়েছিল সে দেশের কংগ্রেস। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ওয়াশিংটন সফরের আগে গত বছরের জুলাই মাসে এফ-৪১৪ জেট ইঞ্জিনের যৌথ নির্মাণের বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্বাক্ষর হয়েছিল। তাতে ছাড়পত্র দিয়েছিল আমেরিকার আইনসভা। কিন্তু বর্তমানে কাজ চলছে যৌথভাবে ১১০ কেএন থ্রাস্ট সরবরাহ করতে সক্ষম আরও শক্তিশালী ইঞ্জিন উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি বিদেশি অংশীদার নির্বাচন করার ব্যাপারে। এই নতুন যুদ্ধ বিমানগুলিতে অন্তিমতম সামরিক প্রযুক্তি রয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে স্টিলথ ফিচার, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) ইন্টিগ্রেশন, দূরপাল্লার এনগেজমেন্ট ক্ষমতা এবং মনুষ্যহীন পদ্ধতির সঙ্গে যৌথভাবে পরিচালনা করার ক্ষমতা।

পরিকল্পনা অনুসারে, চার থেকে পাঁচটি প্রোটোটাইপ বিমান তৈরি করা হবে এবং তারপরে সিরিয়াল প্রোডাকশনের আগে পরীক্ষা ও যাচাই করে নেওয়া হবে। এই যুদ্ধবিমানের জন্য খরচ কয়েক লক্ষ কোটি টাকার মধ্যে থাকতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। আরও গুরুত্বপূর্ণ যে, ব্যক্তি মালিকানাধীন কোম্পানির মাধ্যমে যুদ্ধবিমান তৈরি করা হচ্ছে। দেশে বর্তমানে বেশ কয়েকটি বেসরকারি ক্ষেত্রের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের যুদ্ধবিমান তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড, অ্যারোনটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এবং একটি বেসরকারি ক্ষেত্রের অংশীদারিত্ব নিয়ে গঠিত একটি বিশেষ উদ্দেশ্য যান (এসপিভি) দ্বারা যুদ্ধ বিমানের চূড়ান্ত উৎপাদন করা হবে। এর ফলে, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে একটি বড়ো দেশীয় কোম্পানি হয়ে ওঠার পথও পরিষ্কার হবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

প্রসঙ্গত, ইউরোপ-আমেরিকার দেশগুলিতে প্রতিরক্ষার সমস্ত কোম্পানি ব্যক্তি- মালিকানাধীন। এমতাবস্থায়, বৃহৎ প্রকল্পগুলির জন্য পরিকল্পিত এসপিভি মডেলটি একটি বিশাল ভারতীয় কোম্পানি তৈরি করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি, এটি একটি বড়ো দায়িত্বও বহন করবে। কারণ তৈরি হওয়া বিমানগুলি তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে এর পরিষেবাতে থাকবে। এর জন্য কোম্পানিকে লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম তৈরি করতে হবে। পাশাপাশি, হ্যাল ভবিষ্যতে এএমসিএ উৎপাদন করতে চায় এমন যে কোনো বেসরকারি সংস্থাকে তার বর্তমান সুবিধাগুলি প্রদান করার জন্য প্রস্তাব দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে। □

আগামী নির্বাচন ও নাগরিক কর্তব্য

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

গ্রামের এক বিয়েবাড়িতে নীতীনবাবুর সঙ্গে দেখা। নীতীনবাবু পেশায় শিক্ষক। দশ বছর হলো রিটায়ার করেছেন। সপরিবারে থাকেন ভবানীপুরে। বহুদিন পর বিয়ে বাড়ি উপলক্ষ্যে পুরনো বন্ধুদের একসঙ্গে কাছে পাওয়া। শিক্ষক-অধ্যাপক-অ্যাডভোকেট কে নেই সেখানে! জমিয়ে আড্ডা চলছে। কথায় কথায় রাজনীতিও চলে এল। সামনে লোকসভা নির্বাচন, সেই নিয়ে চলছে জোর আলোচনা। মোদী সরকারের ১০ বছর কেমন কাটলো, কী হবে ভোটে, কে বসবে ক্ষমতায়, নরেন্দ্র মোদী না নতুন ইন্ডি জোট— কার পাল্লা ভারী। পশ্চিমবঙ্গে কার ফলাফল কেমন হবে, শাসক দল কত আসন পাবে, বিজেপি গতবারের পাওয়া আসন ধরে রাখতে পারবে কিনা— এইসব। তবে একটা বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত যে, গত ১০ বছরে দেশ অনেকটা এগিয়েছে, অনেক ভালো এবং কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র সরকার।

দূরে দাঁড়িয়ে আলোচনা শুনছিল বছর চল্লিশের নরেন। গ্রামেই বাড়ি, পেশায় দোকানদার। সে হঠাৎ তাদের কথায় মাঝে এসে পড়ল। বলল, 'একটা কথা বলবো কাকু? আপনারা বলছেন মোদীজী গত ১০ বছরে খুব ভালো কাজ করেছেন। তবে তো এ রাজ্যের বেশিরভাগ আসন তারই পাওয়ার কথা?' নীতীনবাবু বলেন, 'দেখো ভাই, এই ইন্টারনেট-ফেসবুক-হোয়াটসঅ্যাপের যুগে মানুষ এখন সব জানে। সবাই যদি ভেবে চিন্তে ভোট দেয়...'। কথা শেষ হয় না, তাকে থামিয়ে নরেন বলে ওঠে, 'সবাই যদি ভোট দেয়... এই কথাটাই তো আমি বলতে চাইছি কাকু। এদেশের সবাই কি ভোট দেয়? গত নির্বাচনগুলোতে রাজ্যের সবাই কি ভোট দিয়েছিল'? যদি ২০১৯-এর লোকসভা ধরি এই রাজ্যে সর্বসাকুল্যে ভোট পড়েছে প্রায় ৭৫ শতাংশ। তার মানে রাজ্যের ২৫ শতাংশ মানুষ ভোটই দেয়নি। এর সিংহভাগই আবার শহরে। আমরা গাঁয়ের মানুষ, গণতন্ত্র সংবিধান এসব কম বুঝি। কিন্তু আপনারা যারা শিক্ষিত মানুষ তারা কেন গণতন্ত্রের এই উৎসবে ভাগ নিতে চান না? দেশের ২৫-৩০ শতাংশ মানুষই যদি ভোট না দেন তবে দেশে ভালো সরকার আসবে কী করে? গণতন্ত্রের সংখ্যাতত্ত্বে শিক্ষিত মানুষ যদি ভোট কেন্দ্রে না যান তবে সংখ্যার জোরে অসাধু লোকেরাই তো দেশের ক্ষমতা দখল করবে, এটা কি সুস্থ গণতন্ত্রের লক্ষণ?

সকলে চুপ। সত্যিই তো, গত নির্বাচনে অশান্তির কথা ভেবে তারা অনেকেই ভোট দিতে যাননি। ২০২১-এর যাদবপুর বাই ইলেকশনে মাত্র ৫৪ শতাংশ ভোট পড়েছিল। বালিগঞ্জে ৫০ শতাংশের কম। নরেন বলে, 'শুনতে ভালো লাগবে না ঠিকই, কিন্তু বাস্তব হলো এ দেশে হিন্দুদের ঘরে একটি দুটি করে সন্তান। তার ওপর তারা ভোটদানে উদাসীন। বিপরীতে অন্য সম্প্রদায়ের চারটি পাঁচটি করে ছেলেপুলে। সংখ্যায়ও প্রায় ৩০ শতাংশেরও কাছাকাছি। সমীক্ষা বলছে, গত নির্বাচনগুলিতে এরা প্রায় ৯৭ শতাংশ ভোটে অংশ নিয়েছে। তাহলে দাঁড়ালো কী? হিন্দুর ৭০ শতাংশের অর্ধেক ভোটই দিল না, আর ৩০ শতাংশ অন্য সম্প্রদায় একজোট হয়ে ভোট দিয়ে নিজেদের পছন্দমতো প্রার্থীকে জিতিয়ে নিল। মুখে তো আমরা নিজেদের শিক্ষিত বলে দাবি করি, গণতন্ত্র-প্রেমী বলি, কিন্তু সেই গণতন্ত্র যখন প্রয়োগের সময় আসে তখন আমরা ঘরে বসে থাকি, সরকারি ছুটি কাটাই। এ কেমন গণতন্ত্র-প্রীতি? তবে তো চাণক্যের কথাই ঠিক, 'সমাজ দুর্জনদের জন্য নষ্ট হয় না, নষ্ট হয় সজ্জন শক্তির নির্লিপ্ততার কারণে'।

> **"এদেশের নাগরিক সমাজ যেন কোনো কারণে তাদের একটি ভোটও নষ্ট না করেন। সকলে ভোট দিন, রাষ্ট্রহিতে ভোট দিন। আর হ্যাঁ, একটি কথা— নোটায় ভোট— নৈব নৈব চ।"**

তিমিরবাবু বলেন, 'বাবা ভোট দেব কী? যা মারামারি, বোমা, গুলি, বুথ দখল'।...কথা শেষ হয় না, নরেন বলে '৩০ শতাংশ দাঙ্গাবাজ নির্বাচনে হিংসা, গুন্ডামি করবে, আর সত্তর শতাংশ সিঁটিয়ে থাকবে? তবে মনে রাখুন, ভোট দিন আর না দিন, ওদের হিংসা থেকে বাঙ্গালির মুক্তি নেই। আমি তো মোদী ভক্ত, আমার কথা ছাড়ুন। গত একুশের বিধানসভার ভোট গণনার পর যে দাঙ্গা হলো তাতে আমি যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, ঠিক একই ভাবে যারা সরকার পক্ষকে ভোট দিয়েছিল তাদেরও কপালে জুটেছিল শাস্তি, জেহাদিরা কাউকে ছাড়েনি। এমনকী ভোট দিতে না যাওয়া হিন্দুও মার খেয়েছে। বরং আমরা সকলে যদি একজোট হয়ে এই জেহাদি গুন্ডাদের বিরুদ্ধে ভোট দিতাম তবেই মুক্তি পেতাম। তাই ভোট না দিয়ে অত্যাচারীর হাত থেকে বাঁচা যায় না। সামনে লোকসভা নির্বাচন। নিজেদের পরিবার-পুত্র-কন্যার ভবিষ্যতের কথা ভেবে

ফঃ ২

অবশ্যই ঠিক জায়গায় ভোট দিন'।

বিমলবাবু অ্যাডভোকেট। বলেন, 'কাকে ভোট দেবো ভাই? মোদী সরকার ভালো, কিন্তু এবার ভোটে যারা প্রার্থী হবে বলে শুনছি...'। নরেন বলে, 'কাকু, এ নির্বাচন মুখ্যমন্ত্রী গড়ার নির্বাচন নয়। এ নির্বাচন দেশে প্রধানমন্ত্রী গড়ার নির্বাচন। কেন্দ্রে সরকার তৈরি করতে গেলে কোনো সর্বভারতীয় দলকেই আমাদের বেছে নেওয়া উচিত। তৃণমূলের মতো আঞ্চলিক দলকে ভোট দিলে দেশে একটা জোড়াতালি সরকার তৈরি হবে, কিন্তু তার ভবিষ্যৎ কী? অতীতে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ, চন্দ্রশেখর, গুজরাল, দেবগৌড়ার অস্থির সরকার আমরা দেখেছি। শত শত দুর্নীতির অভিযোগ। বরং গত ১০ বছরে কেন্দ্রে স্থায়ী সরকারের বিরুদ্ধে একটি দুর্নীতির অভিযোগও ওঠেনি। আর উপযুক্ত প্রার্থীর কথা বলছেন? শুধু ভালো লোক হলেই হয় না, সেই ভালো লোক কোন দলে আছেন সেটাই বিচার্য। ভালো লোক চোরেদের দলে থাকলে কী হয় পশ্চিমবঙ্গকে দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন? কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দ্রোণাচার্য-কৃপাচার্য-ভীষ্মের মতো ভালো লোকেরা অধার্মিক কৌরবদের দলে ছিলেন। তারা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ দেখেছেন, দুরাচার সহ্য করেছেন, কিন্তু প্রতিবাদ করেননি। ধর্মযুদ্ধে অধর্মের পক্ষ নিয়েছিলেন। এমন ভালো লোক সমাজের কোন কাজে লাগবে? ভালো লোক অধার্মিক দলে থাকলে, তাকে পরাস্ত করাই ধর্ম। এই নির্বাচনও এক ধর্মযুদ্ধ। এযুদ্ধে ব্যক্তি নয়, সঠিক দলকে বেছে নিতে হবে। আমাদের রাজ্যে তৃণমূলের অনেক শিক্ষিত এমপি আছে। কিন্তু লোকসভায় যেদিন কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপের বিল এল, সিএএ পাশ হলো, তিন তালাক রোধের দাবি পেশ হলো— তখন এই শিক্ষিতদের ভূমিকা কী ছিল? তারা সবাই দলের সিদ্ধান্ত মতো এসবের বিরোধিতা করলেন। এই তথাকথিত শিক্ষিত ভালো লোক তবে দেশের কোন কাজে লাগলো? তাই ব্যক্তি দেখে নয়, দেশ- ধর্ম-সমাজ রক্ষায় বদ্ধপরিকর আদর্শনিষ্ঠ দল দেখে ভোট দেওয়া উচিত।

বরুণবাবু বলেন, 'রাজ্য সরকার গরিবের জন্য যে জনমুখী প্রকল্প চালু করেছে ভোটের সময় ইভিএমে তার প্রভাব পড়তে পারে নরেন'। নরেন বলে, 'খুবই দুঃখের, এই রাজ্যের মায়েরা আজ ৫০০/১০০০ টাকার লোভে শাসকের কাছে তার সন্তানের ভবিষ্যৎ বিক্রি করে দিচ্ছেন। ঘরের মেধাবী ছেলেরা আজ রাস্তায় বসে, আর পার্টির ছেলেরা ঘুষ দিয়ে স্কুলে, কলেজ, সরকারি দপ্তরে চাকরি করছে। সর্বক্ষেত্রেই আজ কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি। তার সঙ্গে রয়েছে নির্লজ্জ সংখ্যালঘু তোষণ। বর্ধমানের খাগড়াগড়ে যেদিন বোমা ব্লাস্ট হলো, আইজি মির্জা বললেন 'গ্যাস সিলিন্ডার ফেটেছে'। নর্দমায় বয়ে যাওয়া রক্তস্রোতকে বলা হলো 'মুরগি কাটার রক্ত'। পিংলায় যেদিন বোমা কারখানায় বিস্ফোরণ হলো, নেতারা বললেন 'বিয়ে বাড়ির বাজি ফাটছে'। মালদার কালিয়াচক মিছিলে যখন স্লোগান উঠলো 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ', সরকার চুপ করে থাকল। কালিয়াচকে পুলিশ টেবিলের তলায় লুকায়, সংখ্যালঘু পাড়ায় রেইড করতে গেলে পুলিশের মাথা ফাটে, ক্যানিং, নলিয়াখালি, ধুলাগড়, বাসন্তীর আগুনে হিন্দুরা সন্ত্রস্ত হয়, সিএএ বিরোধী দাঙ্গায় ট্রেন-বাস-সরকারি সম্পত্তি পোড়ে, রামনবমীর মিছিল আক্রান্ত হয়— তখন মনে হয় এই রাজ্য পশ্চিম বাংলাদেশ হয়ে যাবে না তো? যখন কামদুনির ধর্ষিতা নাবালিকাটি বিচার পায় না, কালিয়াগঞ্জ-হাঁসখালি-বসিরহাট-মালদার জনজাতি মহিলার ধর্ষণকারীদের শাস্তি হয় না, তখন মনে হয় আমাদের দেশে তালিবানি শাসন এসে যায়নি তো? আজকের সন্দেশখালিতে শাজাহান শেখেরা যখন গভীর রাতে আমাদের বাড়ির মা-বোনেদের ডেকে পার্টি অফিসে (হারেম) নিয়ে যায়, তখন মনে হয় শ্যামাপ্রসাদের তৈরি 'হিন্দু বাঙ্গালির শেষ আশ্রয়' এই পশ্চিমবঙ্গ ভারতে থাকবে তো? যে রাজ্যের স্কুলে কেবল বিশেষ সম্প্রদায়ের ছাত্রীদের ঐক্যশ্রী ভাতা দেওয়া হয়, কয়েক কোটির ফাইভস্টার হজ হাউস বানানো হয়, রাজ্যের শাসক নেতার নির্দেশে দুর্গাপূজার প্যান্ডেলে আজানের সুর ভেসে ওঠে, তখন মনে হয় এরা যদি কোনোক্রমে দেশের শাসন ক্ষমতা হাতে পায়, আমার তাহলে আপনার ঘরে দল বেঁধে নামাজ পড়তে লোক ডেকে আনবে না তো? ভয় ঠিক তখনই লাগে।

সূর্যবাবু কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতা। বলেন 'আমাদের বাম আমলে কিন্তু এই হাল ছিল না'। নরেন বলে, 'দেশের কথা জানি না, কিন্তু আপনাদের ৩৫ বছর শাসনকালে আপনারা যা করেছেন তার পাপেই তো আজ এই হাল, সবেতেই শূন্য। পুরোনো দিনের মরিচঝাঁপি, বিজনসেতু, কেশপুর, গোঘাট, নন্দীগ্রাম, নেতাইয়ের গণহত্যার কথা না হয় বাদই দিলাম। কিন্তু সংখ্যালঘু তোষণে আপনাদের সঙ্গে বর্তমান শাসক দলের পার্থক্যটা কোথায়? আমরা তো বাঙ্গালি তাই না? আচ্ছা বলুন তো, বাংলা শব্দকোষে 'ইনসাফ' বলে কোনো শব্দ আছে? না নেই, এ উর্দু ভাষা। তবে আপনাদের প্রতিবাদ সভার নাম 'ইনসাফ সভা' কেন? আপনাদের নেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জি পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে 'ইনসাফ যাত্রা' করেন কেন? কাদের বার্তা দিতে? আসলে মুসলমানদের আপনারা বোঝাতে চান 'আমি তোমাদেরই লোক'। আপনাদের রাজ্য সম্পাদক কমরেড সেলিম তার পুত্রের বিয়ের কার্ডে 'ইনশা আল্লাহ' লিখতে পারে, হালিম-রেজ্জাকদের টুপি-নামাজ-রোজা-হজে আপত্তি নেই, কিন্তু সুভাষ কিংবা শঙ্কর যেই কপালে তিলক কেটে মন্দিরে গিয়ে 'জয় মা তারা' বলবেন— অমনি সর্বশক্তিমান মার্কসবাদ 'খতরে মে' পড়ে যাবে। ক'দিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ববি হাকিমের একটি ভিডিয়ো ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেখানে তিনি বলছেন, 'অদূর ভবিষ্যতে আমি দেখতে চাই এই বঙ্গের ৫০ শতাংশ মানুষ উর্দু ভাষায় কথা বলছে'। আচ্ছা উর্দু ভাষায় কারা কথা বলে? হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, পার্সি, শিখ, মতুয়া, সাঁওতাল, লোধা, শবর... কারা? এদের কেউই নয়। শুধু মুসলমান সম্প্রদায়। তার মানে রবিবাবু বলছেন তিনি শ্রীচৈতন্য-রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথের বাঙ্গলাকে মুসলমান

গরিষ্ঠ দেখতে চান। আর আপনারাও- বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম বিবেকানন্দের বাঙ্গলাকে 'ইনসাফের ইসলামি শাসনে' নিয়ে আসতে চান। কি মিল না? আপনাদের বেশিরভাগ নেতাই তো দেশভাগের সময় পূর্বপুরুষের জন্মভূমি ছেড়ে নিজের ধর্ম আর মায়েদের ইজ্জত বাঁচাতে পূর্ববঙ্গ ছেড়ে এই পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে এসেছিলেন। সেখানে চাচাদের হাতে মার খেয়েও সর্বধর্ম সমন্বয়ের নেশা ছুটলো না। এখানে এসে স্লোগান দিচ্ছেন 'মানুষের লড়াই ভাতের জন্য, জাতের (ধর্মের) জন্য নয়'। যদি ভাতের জন্য লড়াই-ই ছিল তবে সেদিন আপনারা দেশত্যাগ করেছিলেন কেন? টুক করে একবার সুন্নত করে, 'কলেমা' পড়ে নিলেই তো হতো। নিশ্চিন্তে সেখানেই ভাত পেতেন, দেশ ছাড়তে হতো না। সর্বধর্মসমন্বয় দেখাতে হিন্দুপ্রধান ভারতে আসতে হলো কেন, সেদেশে সর্বধর্ম সমন্বয় হলো না? আসলে সেদেশে হিন্দুর সর্বনাশতো করেইছেন, আবার এখানে এসে এই বঙ্গের হিন্দুদেরও সর্বনাশ করতে চান। সেই লেজকাটা শেয়ালের গল্প। আপনারা ভোট জিতলে হিন্দুর এই পশ্চিমবঙ্গকে চিরতরে ইসলামিক দেশ বানিয়েই ছাড়বেন।

দীপকবাবু বলেন 'ঠিকই বলেছ নরেন, এ দলগুলি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের সামনে দুটি পথ— একটি বিজেপি আর অন্যটি কংগ্রেস'। 'কংগ্রেস'? নরেনের চোখে যে বিদ্যুৎ খেলে গেল। বলে 'যে কংগ্রেস সিংহাসনের লোভে দেশভাগ করেছে, যাদের শাসনকালে ২-জি/৩-জি-সহ দুর্নীতির শত শত অভিযোগ, যাদের শাসনকালে চীন-পাকিস্তান পালা করে প্রতিদিন ভারতকে চোখ রাঙিয়েছে, যে কংগ্রেস আমলে আফজল-কাসবের দল সারাদেশে অবাধে হত্যালীলা চালিয়েছে, দিল্লি-কাশ্মীর- গুজরাট-ইউপি- তামিলনাড়ু-সহ দেশের বিভিন প্রান্তে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, যে কংগ্রেসের সর্বময় নেত্রী বাটলা হাউস এনকাউন্টারে নিহত উগ্রপন্থীর বাড়িতে পার্টির নেতা পাঠিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে এসেছে, যে কংগ্রেসের শাসনে সৈয়দ গিলানি, ইয়াসিন মালিকের মতো বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতারা প্রধানমন্ত্রীর আবাসে বসে মহানন্দে বিরিয়ানির ভোজ খেয়েছে আর কাশ্মীরে উগ্রবাদীরা প্রতিদিন সেনার উপর পাথর ছুঁড়েছে, যে কংগ্রেসের জমানায় উগ্রপন্থী বুরহানের জানাজায় লাখো-বিচ্ছিন্নতাবাদী 'হিন্দুস্তান মুর্দাবাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান দিয়েছে, যে কংগ্রেস হিন্দুধর্মকে অপমান করতে 'স্যাফ্রন টেরোরিজম' অর্থাৎ গৈরিক সন্ত্রাস শব্দের উদ্ভব করেছে, সাধবী প্রজ্ঞা, স্বামী অসীমানন্দের মতো হিন্দু সন্ন্যাসীদের মিথ্যা মামলায় জেলে বন্দি করেছে, যে কংগ্রেস ২০১১ সালে 'প্রিভেনশন অব কমিউনাল অ্যান্ড টার্গেটেড ভায়োলেন্স বিল' এনে হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে— সেই কংগ্রেস? আগামী নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রের যাওয়ার আগে এই কথাগুলোও আমাদের স্মরণে রাখতে হবে। কেউ যদি বলেন আমি কংগ্রেসকে ভোট দিই কিন্তু তার সব সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমি সহমত নই, তবে সে ধূর্ত। আপনার একটি ভোটের দ্বারা নির্বাচিত সরকারই দেশে আইন তৈরি করে। তাই আপনার নির্বাচিত সরকারের কুকর্মের দায়ও আপনার।

নীতীনবাবু বলেন, 'নরেনের কথায় যুক্তি আছে। এই নির্বাচন দেশ গড়ার নির্বাচন। তাই কথাগুলি মোটেই ফেলে দেওয়ার নয়'। নরেন বলে 'দেশ আজ অনেক এগিয়েছে। দরিদ্র মানুষ বিনামূল্যে অন্ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান পাচ্ছে। অর্থনীতি, অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা, সীমান্ত সুরক্ষা, স্বাবলম্বন, বিজ্ঞান, বৈদেশিক নীতি--- সবেতেই আজ ভারত বিশ্ব গুরু হওয়ার পথে। এসবই 'এক-আঙুলের' শক্তি। দ্বাপর যুগে ভগবান কৃষ্ণ 'এক আঙুলে' গিরি গোবর্ধন তুলে ধরেছিলেন, দেখিয়েছিলেন তাঁর অপার মহিমা। ২০১৪-তে এদেশের জনতা জনার্দনও 'এক আঙুলে' ইভিএম-এর বটম টিপে যে শক্তির প্রকাশ দেখিয়েছিল তার প্রমাণ পাচ্ছি। সেই জোরেই পাকিস্তানে সার্জিকাল স্ট্রাইক হয়েছে, কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিল হয়েছে, নকশালি সন্ত্রাস প্রায় সমাপ্ত হয়েছে, তিন তালাক বন্ধ হয়েছে, ৫০০ বছর পর অযোধ্যায় রামমন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে, পাকিস্তান ভিখারি হয়েছে, চীনের রক্তচক্ষু হলদেটে হয়েছে, আরবে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে, চাঁদের মেরুপ্রদেশে চন্দ্রযান ল্যান্ড করেছে, সারা বিশ্ব 'ভারতমাতা কী জয়' বলছে... আরও কত কী। সবই আমাদের এক-একটি ভোটের ফল।

তবু এখনও অনেক কাজ বাকি। এখনো এনআরসি হয়নি, সারাদেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু হয়নি, গোহত্যা বন্ধ হয়নি, পৃথিবীতে ২০০ কোটি হিন্দুর 'হিন্দুরাষ্ট্র' ঘোষণা হয়নি, কাশী মথুরা মুক্তি পায়নি, সম্পূর্ণ কাশ্মীর ভারতে আসেনি, দেশ ভাঙার স্বপ্নে বিভোর 'টুকরে টুকরে গ্যাং' ধ্বংস হয়নি, 'বন্দেমাতরম'কে অপমান করা, গীতা পোড়ানো কমিউনিস্টরা সমাপ্ত হয়নি... অনেক কিছুই বাকি। শাস্ত্রে বলেছে 'ত্যজেদেকং কুলস্বার্থে গ্রামস্বার্থে কুলং ত্যজেৎ। গ্রামং জনপদ স্বার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ'।। -এর অর্থ হলো বড়ো হিতের জন্য ছোটো স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে হয়। আমাদেরও দেশের ভালোর জন্য নিজেদের ছোটোখাটো চাওয়া-পাওয়ার স্বার্থ দূরে সরিয়ে রেখে একযোগে ভোট দিতে হবে। এদেশের নাগরিক সমাজ যেন কোনো কারণে তাদের একটি ভোটও নষ্ট না করেন। সকলে ভোট দিন, রাষ্ট্রহিতে ভোট দিন। আর হ্যাঁ, একটি কথা— বামপন্থী প্রচারে নোটায় ভোট--- নৈব নৈব চ। দেশভক্ত দলের প্রার্থীকেই ভোট দিন। তবেই গণতন্ত্র বাজবে, দেশ বাঁচবে, ধর্ম বাঁচবে। আমরা সবাই বাঁচবো। □

With Best Compliments from -

A

Well Wisher

শত ষড়যন্ত্রের নাগপাশ ছিন্ন করে দেশনায়ক সুভাষচন্দ্রকে যথাযোগ্য মর্যাদায় ভূষিত করেছে বর্তমান কেন্দ্র সরকার

ডঃ পঙ্কজ কুমার রায়

১৮৯৭ সালের ২৩ জানুয়ারি কলম্বোর হিন্দু কলেজ ময়দানে স্বামী বিবেকানন্দ বললেন, আমরা নিজেদের বৈদান্তিক বলে আখ্যায়িত করব। সেই দিনের সেই আহ্বান কটকজাত শিশু সুভাষের কানে পৌঁছলো। সুভাষচন্দ্র বসু পরবর্তীকালে বলেছিলেন, আমি বিবেকানন্দকে গুরু বলে মানি। তরুণ সুভাষের 'তরুণের স্বপ্ন'-এর বীজ রোপিত হয়েছিল ছোটোবেলায়। কটক থেকে মাকে লিখছেন,

'মা, ভারতবর্ষ ভগবানের বড় আদরের স্থান—এই মহাদেশে লোকশিক্ষার নিমিত্ত ভগবান যুগে যুগে অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পাপক্লিষ্ট ধরণীকে পরিত্রাণ করিয়াছেন এবং প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে ধর্মের ও সত্যের বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন। ভগবান মানবদেহ ধারণ করিয়া নিজের অংশাবতার রূপে অনেক দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু এতবার তিনি কোনও দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই—তাই বলি আমাদের জন্মভূমি ভারতমাতা ভগবানের বড় আদরের দেশ।

আপনার ছেলে
সুভাষ'

সুভাষচন্দ্র বসু ১৯১৪ সালের গ্রীষ্মাবকাশে ভারত ভ্রমণে বের হন। অনেক মন্দির, অনেক সাধুসঙ্গের পর তিনি বারাণসীতে এসে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দের সান্নিধ্যে শান্তি লাভ করেন এবং ঋষিতুল্য জীবনবোধ উপলব্ধি করেন। ১৯২১ সালে আইসিএস উত্তীর্ণ সুভাষ ব্রিটিশের জলপানির অর্থ ১০০ পাউন্ড ফেরত দিয়ে ১৬ ফেব্রুয়ারি কেম্ব্রিজ থেকে চিত্তরঞ্জন দাশকে যে চিঠি লিখলেন তা এক অর্থে আনন্দমঠের সত্যানন্দের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি।

তিনি লেখেন, "....আপনি বাংলাদেশে আমাদের স্বদেশ সেবাযজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক, তাই আপনার নিকট আমি উপস্থিত হয়েছি আমার যৎসামান্য বিদ্যা, বুদ্ধি ও উৎসাহ নিয়ে। মাতৃভূমির চরণে উৎসর্গ করবার মত আমার বিশেষ কিছুই নেই। আছে শুধু নিজের এই তুচ্ছ শরীর। আপনাকে এই পত্র লেখার উদ্দেশ্য শুধু আপনাকে জিজ্ঞাসা করা আপনি আমাকে এই বিপুল সেবাযজ্ঞের কি কাজ দিতে পারেন? .....আমার আর কিছু বলার নেই। আমি আজ প্রস্তুত। আপনি শুধু কর্মের আদেশ দিন।"

দেশে ফিরে সুভাষ কংগ্রেসে যোগদান করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সংস্পর্শে আসেন। ১৯২৪ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের সিইও নিযুক্ত হন। ১৯২৫ সালে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ব্রিটিশ দমনপীড়ন নেমে আসে। যুব নেতা সুভাষ গ্রেপ্তার হন এবং তাঁকে বার্মার মান্দালয় জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। সুভাষ মান্দালয় জেলে থাকা অবস্থায় দুর্গাপূজা আয়োজনের তোড়জোড় শুরু করেন। ৮০০ টাকা পূজা বাজেটের ১৪০ টাকা সব বন্দি চাঁদা হিসেবে দেন এবং তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার ৬৬০ টাকা অগ্রিম দেয়, যা পরবর্তীকালে বন্দিদের অর্জিত অর্থ থেকে কেটে নেওয়া হয়। পূজা আয়োজন করতে পেরে তিনি যে খুশি তা দেশবন্ধুর সহধর্মিণী বাসন্তী দেবী এবং পিতা জানকীনাথ বসুকে চিঠি লিখে ব্যক্ত করতে ভোলেননি।

২০২২ সালে সংসদ ভবনের সামনের রাজপথের নতুন নামকরণ করেন কর্তব্যপথ এবং পঞ্চম জর্জের মূর্তি সরিয়ে গ্রানাইট পাথরে প্রস্তুত নেতাজীর আবক্ষমূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কেন্দ্রীয় সরকার ২০২২ সাল থেকে ব্যক্তিবিশেষে কিংবা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নিঃস্বার্থ সমাজ সেবার অবদানের জন্য 'সুভাষচন্দ্র বসু আপদা প্রবন্ধন পুরস্কার' ঘোষণা করেন।

কংগ্রেসে থাকা অবস্থাতেই সুভাষের রাজনৈতিক সত্তা স্বতন্ত্র পথ পরিগ্রহ করতে শুরু করে। ১৯২৮ সালে জহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। মোতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে 'নেহরু সংবিধান' নামে খ্যাত খসড়া সংবিধানে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দানের কথা বলা হয়। সুভাষচন্দ্র সংশোধনী এনে বললেন, ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস নয়, চাই পূর্ণ স্বরাজ। গান্ধীজী একবছর আবেদন-নিবেদনের সময় চান এবং সুভাষের সংশোধনী খারিজ হয়ে যায়। ১৯২৯ সালে লাহোরের ইরাবতীর তীরে মোতিলাল নেহরু জহরলালের হাতে কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্ব তুলে দিলেন। কংগ্রেস রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্রের বীজ প্রোথিত হলো। ১৯২৯ সালে গান্ধী পূর্ণ স্বরাজের দাবিতে প্রস্তাব আনেন। সুভাষ এবারও পূর্ণ স্বরাজ নয়, সমান্তরাল সরকারের প্রস্তাব আনেন। যথারীতি সুভাষের প্রস্তাব পাশ হয়নি। জাতীয় কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি দেশের সর্বত্র স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস পায়, যা সুভাষচন্দ্র বসু ১৯২৮ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে বিরোধিতা করে প্রস্তাব এনেছিলেন। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি গণতন্ত্র দিবসে প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা লাভ হয়েছে। দেশভাগের জন্য এত ব্যাকুলতার কী কারণ ছিল!

১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র

বসু জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। সেই বছর জহরলাল নেহরুকে সভাপতি করে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেন। ১৯৩৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর বম্বেতে অনুষ্ঠিত সারা ভারত প্ল্যানিং কমিটির প্রথম সভায় সুভাষচন্দ্র বসু উদ্বোধনী ভাষণ দেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় জহরলাল নেহরু প্ল্যানিং কমিটির সভাপতি হিসেবে কোনো প্রতিবেদন কংগ্রেসকে কখনও পেশ করেননি। ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসে পট্টভি সীতারামাইয়াকে ১৫৮০—১৩৭৭ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। পট্টভির পরাজয়ের পর গান্ধীজীর বিখ্যাত খেদোক্তি, 'পট্টভীর পরাজয় মানে আমার পরাজয়।' জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে চোদ্দজন বাঙ্গালি কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র বসু শেষ বাঙ্গালি সভাপতি যিনি সভাপতি নির্বাচিত হন কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে অসমর্থ হন। ফলস্বরূপ কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে সুভাষচন্দ্র বসু পদত্যাগ করেন। বলা ভালো, পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। ১৯৩৯ সালের মে মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির মিটিঙের ৫২তম অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের সভাপতির পদে ইস্তফা দিয়ে বিবৃতি দিয়ে বলেন, ''আমাদের দুর্ভাগ্য, মহাত্মাজী ওয়ার্কিং কমিটি মনোনয়ন করতে অক্ষমতা বোধ করেছেন। এই আক্ষেপের পেছনে গান্ধীজীর অনমনীয় জেদ কাজ করেছে। ২ এপ্রিল ১৯৩৯ সুভাষচন্দ্র বসুকে লেখা গান্ধীজীর চিঠি পড়লে বোঝা যায় গান্ধীজী সুভাষকে পদত্যাগের বার্তা ইতিপূর্বেই দিয়েছিলেন। সুভাষের উদ্দেশ্যে গান্ধী লেখেন,

''তোমার পত্রের 'সম্পূর্ণ' জবাব পাঠালাম। তাহাতে আমার উপদেশ পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব নিরপেক্ষ এবং দুই মতাবলম্বীদের ধারণা একেবারে বিপরীত হওয়ায় তুমি সম্পূর্ণভাবে তোমার নীতিতে বিশ্বাসী লোকদের লইয়া নিজস্ব ক্যাবিনেট গঠন কর। তোমার নীতি ও কর্মপদ্ধতি ঠিক করিয়া প্রকাশ করিবে এবং এআইসিসি-র নিকট পেশ করিবে। যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ কর, বিনা বাধায় তোমার কার্যপদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করিতে সক্ষম হইবে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না করিলে, তোমার পদত্যাগ করা এবং এআইসি.সি-কে নূতন প্রেসিডেন্ট মনোনীত করিতে বলা উচিত হইবে। সততা ও সদিচ্ছা থাকিলে গৃহযুদ্ধের ভয় আমি করি না।

ভালোবাসা

বাপু

সুভাষ বহুবার গান্ধীর সহযোগিতা চাওয়ার পরও এই চিঠি প্রমাণ করে পদত্যাগ অনিবার্য ছিল। এরপর দেশজোড়া প্রচারে বের হন সুভাষ। পরিণতি কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার। সাংবাদিক এম. জে. আকবর পরবর্তীকালে বলেছিলেন, ''The two great Bengali heroes of the 20th century are surely Bose and Basu. Subhas and Jyoti. Both should have become Prime Ministers, are stopped by fate, the owner prevented by his own party.''

কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত সুভাষচন্দ্র বসু ৩ মে, ১৯৩৯ ফরওয়ার্ড ব্লক তৈরি করেন। হিন্দু মহাসভার সঙ্গে ফরওয়ার্ড ব্লকের মতবিরোধ সত্ত্বেও ১৯৪০ সালের কর্পোরেশন নির্বাচনে জোট হয়, যদিও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। Forward Bloc-এ সুভাষ বসু লেখেন, ''It (Hindu Mahasabha) has come forward to play a political role and to make a bid for the political leadership of Bengal, or at least of the Hindus of Bengal, who have been the backbone of nationalism in this country. With a real Hindu Mahasabha, we have no quarrel and no conflict. But with a political Hindu Mahasabha that seeks to replace the Congress in the public life of Bengal and for that purpose, has already taken the offensive against us, a fight is inevitable. This fight has just begun.'' অর্থাৎ প্রকৃত হিন্দু মহাসভার সঙ্গে কোনো বিরোধ বা বিবাদ নেই। হিন্দু মহাসভা জাতীয়তাবাদের ধারক ও বাহক। কিন্তু রাজনৈতিক বিরোধ অনিবার্য, যা সবে শুরু হয়েছে। সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে জোট প্রসঙ্গে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী Leaves from a Diary-তে লিখেছেন, ''Due to the attack on Hindu rights, we wanted a strong Hindu Sabha Party in the corporation. We were prepared to work with Subhas and run election jointly, provided we also worked as a team in the Corporation later on. Subhas agreed to this when he found that our strength was not entirely negligible.'' যদি এই জোট বাস্তবায়িত হতো, তবে ভারতের রাজনীতি ভিন্নখাতে বইত। ১৯৬৫ সালে 'Organiser'- সাপ্তাহিকে এক সাক্ষাৎকারে বীর সাভারকর ভারতের স্বাধীনতার যে পাঁচটি কারণ উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসুর ও আইএনএ-র ভূমিকা দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারণ করেন।

১৯৪১ সালের ১৬–১৭ জানুয়ারি রাতে কলকাতার এলগিন রোডের বাড়ি থেকে সুভাষচন্দ্র বসুর মহানিষ্ক্রমণ ঘটে। সুভাষ কাবুল থেকে মস্কো হয়ে বার্লিনে এসে পৌছোন। পরবর্তীকালে জাপানে এসে রাসবিহারী বসুর কাছ থেকে ১৯৪২-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির (I.N.A) দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। অন্যদিকে জাপান মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধজয় করতে করতে ভারতের পূর্ব সীমান্তে উপস্থিত হন। ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে সিঙ্গাপুরের পেডং-এ 'দিল্লি চলো'-র ডাক দিলেন। সদর্পে ঘোষণা করলেন, ''তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।'' ১৯৪৩ সালের

২১ অক্টোবর সকাল দশটায় আর্জি হুকুমতে আজাদ হিন্দ নামক স্বাধীন ভারত সরকার বলা ভালো অখণ্ড ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী সুভাষচন্দ্র বসু কয়েকটি শব্দের মধ্য দিয়ে শপথ নিলেন– 'আমি সুভাষ চন্দ্র, ভগবানের নামে পবিত্র শপথ গ্রহণ করছি যে ভারতবর্ষ ও আমার আটত্রিশ কোটি ভারতবাসীর স্বাধীনতার জন্য যতদিন জীবন থাকবে ততদিন লড়াই চালিয়ে যাবো।" ("In the name of God, I take this sacred oath that to liberate India and thirty eight crores of my countrymen. I, Subhas Chandra Bose, will continue this sacred war of freedom unit the last breath of my life.")

১৯৪৩ সালের ৬ নভেম্বর জাপানের প্রধানমন্ত্রী হিদেকি তোজো (Hideki Tojo) আন্দামান ও নিকোবরকে আজাদ হিন্দ সরকারের কাছে সমর্পণ করেন। ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৪৩ স্বাধীন আন্দামানে পা রাখলেন দেশনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৪৩ পোর্ট ব্লেয়ারের জিমখানা ময়দানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। সেখান থেকে সেলুলার জেলে যান এবং বন্দিদের মুক্তি ঘোষণা করেন। আন্দামান ও নিকোবরকে স্বাধীন ঘোষণা করে এ ভি লোকনাথকে দ্বীপগুলির গভর্নর নিযুক্ত করেন। আন্দামান-নিকোবর দ্বীপের নামকরণ করেন শহিদ ও স্বরাজ।

১৯৪৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি আইএনএ আরাকান অঞ্চল অতিক্রম করে এবং ১৮ মার্চ, ১৯৪৪ ভারতের পবিত্রভূমি স্পর্শ করে। ইতিমধ্যে ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৫ জার্মানির আত্মসমর্পণের পর জাপান আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। নেতাজী ১৭ আগস্ট, ১৯৪৫ সাইগন বিমানবন্দর ছাড়েন এবং প্রচার করে দেওয়া হয় ১৮ আগস্ট, ১৯৪৫ তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ততদিনে নেতাজীর ভূত নেহরুকে তাড়া করে ফিরছিল। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, নেতাজীর একান্ত সচিব মেজর আবিদ হাসানকে কোনো এক অজ্ঞাত কারণে শাহনওয়াজ কমিশনে সাক্ষী দিতে ডাকা হয়নি কিন্তু খোসলা কমিশনে ডাকা হয়েছিল। ১৭ আগস্ট, ১৯৪৫ নেতাজী যখন সাইগন ছাড়েন আবিদ হাসান সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মেজর আবিদ হাসান বলেন, ".... সেদিন নেতাজী ফিরলে গোটা দেশ নিশ্চয় তাঁর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হতো এবং ভারত-ভাগ্যের দুর্দৈব ঘটত না। তিনি তাইহোকু দুর্ঘটনাতে মারা যাননি। তবে কোথায় মারা গেছেন তা আমি জানি না। হয়তো তাঁকে বন্দি করে অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তাঁর স্বাস্থ্য যেমন ভালো ছিল তাতে সেই সময় তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটা অস্বাভাবিক ছিল।" বহু তথ্য বলে, সেদিন বা তার কাছাকাছি সময়ে তাইহোকুতে কোনো বিমান দুর্ঘটনা ঘটেনি। ১৯৪৫ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৪৬ মে মাসের মধ্যে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির ট্রায়াল হয় লালকেল্লায়।

নেতাজী গবেষক ড. পূরবী রায় আইএনএ-র ৭২,০০০ কোটি টাকা নেহরু কোথায় রেখেছেন সেই প্রশ্ন তুলেছেন। ব্রিটিশরাজ ষষ্ঠ জর্জের স্ট্যাচু পার্লামেন্টে স্বাধীনতার ২০ বছর পরেও ছিল, কিন্তু স্বাধীনতার ৩০ বছর পরও পার্লামেন্টে নেতাজীর কোনো প্রতিকৃতি স্থান পায়নি। ১৯৭৭ সালে জনতা দলের সরকারের সময় প্রথম নেতাজীর তৈলচিত্র পার্লামেন্টে স্থান পায়। কংগ্রেসের এ এক অদ্ভুত দ্বিচারিতা। কিন্তু দেখুন, আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠার দিন ২১ অক্টোবরকে স্মরণে রাখতে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ১৯৫১ সালের ২১ অক্টোবর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীর সঙ্গে অনেক চিন্তন মন্থনের পর জনসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। অথচ কংগ্রেস এনআইএ সদস্যদের স্বাধীন ভারতের সেনাবাহিনীতে কোনো স্থান দেননি। বরং ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার সেনাদের স্বাধীন ভারতের সেনা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে। নেতাজীর ৩৩টি ফাইল ডি-ক্লাসিফাই প্রথম হলো ২০১৫ সালে ১৪ অক্টোবর এবং প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে জাতীয় সংগ্রহশালায় হস্তান্তরিত করা হয়।

২০১৮ সালের ২১ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজাদ হিন্দ সরকারের ৭৫ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে অখণ্ড ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এই বছর ৩০ ডিসেম্বর আন্দামান-নিকোবর সফরকালে প্রধানমন্ত্রী নেতাজীর বিজয়কে স্মরণীয় করতে হ্যাভলক আইল্যান্ডকে স্বরাজ দ্বীপ, নীল আইল্যান্ডকে শহিদ দ্বীপ এবং রস আইল্যান্ডকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র দ্বীপ হিসেবে ঘোষণা করেন। ইতিপূর্বে রাস্তা, মঞ্চ, স্কুল, কলেজ কিম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম স্বাধীনতা সংগ্রামীর নামে উৎসর্গ করা হয়েছে, এই প্রথম ভারতের স্বাধীনতার মূলকাণ্ডারি নেতাজীর নামে দ্বীপ উৎসর্গ হওয়াতে ভারতবাসী গর্বিত। ২০১৯ সালে লালকেল্লায় চারটি সংগ্রহশালা উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মহা বিদ্রোহ থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের গাথা তার মধ্যে অন্যতম। আইএনএ গণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে প্রথম আমন্ত্রিত হয় ২০২০ সালে। ২০২১ সালের ২৩ জানুয়ারি কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারে নেতাজী নামাঙ্কিত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২০২২ সালে সংসদ ভবনের সামনের রাজপথের নতুন নামকরণ করেন কর্তব্যপথ এবং পঞ্চম জর্জের মূর্তি সরিয়ে গ্রানাইট পাথরে প্রস্তুত নেতাজীর আবক্ষমূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কেন্দ্রীয় সরকার ২০২২ সাল থেকে ব্যক্তিবিশেষে কিংবা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নিঃস্বার্থ সমাজ সেবার অবদানের জন্য 'সুভাষচন্দ্র বসু আপদা প্রবন্ধন পুরস্কার' ঘোষণা করেন।

২০২১ সালের ২৩ জানুয়ারি নেতাজীর ১২৫ তম জন্মজয়ন্তীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পরাক্রম দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন। ২০২৩ সালের ২৩ জানুয়ারি ৮.৪৩ মিনিটে এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, "Today, on Parakram Diwas, I pay homage to Netaji Subhas Chandra Bose and recall his unparalleled contribution to India's history. He will be remembered for his fierce resistance to colonial rule. Deeply influenced by his thoughts, we are working to realise his vision for India."

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ১২৬৩তম জন্মদিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে নেতজী সুভাষচন্দ্রের নামে উৎসর্গীকৃত জাতীয় সৌধের প্রস্তাবিত মডেলটির ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু দ্বীপে এই জাতীয় সৌধটি স্থাপিত হবে। ভারতের স্বরাষ্ট্রদপ্তর ৭৫তম বর্ষে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উপলক্ষ্যে পুস্তিকায় প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, "One of such great son of Mother India was Netaji Subhas Chandra Bose whose contribution to the independence movement has inspired generations of Indians and inculcates a safe of pride amongst the countrymen."

আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপ

পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আত্মনির্ভর দেশ গঠনে মৌলিক ও সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্তগুলির অন্যতম হলো জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন। ২০২০ সালের জুলাই মাসে এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। শিক্ষাবিদদের মতে এই নীতি— শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে।

প্রাচীন ভারতবর্ষের সমৃদ্ধ জ্ঞান, প্রজ্ঞা, চিন্তাধারার পরম্পরা তথা সনাতনী মূল্যবোধ আধারিত এই শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে যাতে গুণগত শিক্ষা গ্রহণে সমান সুযোগ পায়।

বুনিয়াদি শিক্ষায় জোর : 'কী পড়ব' বা 'কী শিখব' নয়; 'কীভাবে পড়ব', 'কীভাবে শিখব'— এর ওপরেই জোর দেওয়া হয়েছে। ৩-১৮ বছর বয়সিদের বিদ্যালয় শিক্ষাকে ৫+৩+৩+৪ পদ্ধতিতে (আগের ১০+২) বদলানো হয়েছে। ৩ থেকে ৬ বছর বয়সের শিশুরা বর্তমানে ১০+২ কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত নয়। অথচ ৮৫ শতাংশেরও বেশি ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের বিকাশ শিশুর ছ'বছর বয়সের আগেই ঘটে যায়। নতুন শিক্ষানীতিতে বুনিয়াদি সাক্ষরতা ও প্রাথমিক গাণিতিক জ্ঞানের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাঠ্যক্রম, অতিরিক্ত পাঠ্যক্রম, সহ-পাঠ্যক্রম তথা কলা, বিজ্ঞান, মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান বা বৃত্তিমূলক ও অ্যাকাডেমিক পাঠ্যশাখার মধ্যে কোনো সুস্পষ্ট ভেদাভেদ রাখা হয়নি। মুখস্থ বিদ্যা এবং পরীক্ষার জন্য পড়ার বদলে অভিজ্ঞতালব্ধ ও প্রায়োগিক শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা তার্কিক, যুক্তিসঙ্গত ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং নতুনত্বের প্রতি সর্বদা উৎসাহিত হতে পারে। পাঠ্যক্রম পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যক্তিমনে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আস্থা, সেবার মানসিকতা, দায়িত্ববোধ, সংবিধানের প্রতি দায়বদ্ধতা, বহুত্ববাদ, সমতা ও ন্যায়ের বোধ জাগ্রত করা এবং তার ফলে দেশের প্রতি সম্মান ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর যাতে বিকাশ ঘটে তার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে। এ কারণে পরীক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তনও হচ্ছে।

পাঠ্যক্রমে নমনীয়তা ও আজীবন শিক্ষা সুযোগ : আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে সায়েন্স, আর্টস, কর্মাসের সুস্পষ্ট বিভাজন থাকছে না। ফলে কোর্স চয়ন করার সময় নমনীয় ব্যবস্থা থাকছে। যেমন বিজ্ঞানের সঙ্গে ইতিহাস বা অঙ্কের সঙ্গে সংস্কৃত বা চারুশিল্পের পাঠ নেওয়া যাবে। আবশ্যিক ও প্রয়োজনীয় বিষয়ে ব্যুৎপত্তি বাড়াতে পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু হ্রাস, অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষার উপর জোর ও পছন্দসই কোর্স নেওয়ার ব্যবস্থা থাকছে। পাঠ্যক্রমে প্রয়োজনীয় বিষয় সংযোজন, ভাষা শিক্ষা, শিক্ষার্থীদের ক্ষমতায়ন, দক্ষতার উপর জোর, প্রতিভাধর ও মেধাবীদের সহায়তা এবং মূল্যায়নের আমূল পরিবর্তনের নিরিখে জাতীয় পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত স্থানীয় আস্বাদ ও বিষয়বস্তু সংবলিত পাঠ্যপুস্তক রচনা করা হচ্ছে। পাঠ্য বিষয়ের পরিবর্তন করা হচ্ছে এমন ভাবে যাতে স্ব (আত্ম)-চেতনা বৃদ্ধি, চিন্তন ও মনন যথা বিশ্লেষণাত্মক চিন্তা, ভিন্নমুখী চিন্তা, সৃজনশীল চিন্তার সঙ্গে সমালোচনামূলক চিন্তার উন্মেষ ঘটবে। সমালোচনা গ্রহণ করার মানসিকতা তৈরি হবে এবং মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে। শেষে সহানুভূতি ও সহমর্মিতার মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সমস্যার সমাধান করতে পারবে। ফলে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা তৈরি হবে। ডিগ্রি কোর্স তিন থেকে চার বছরের হবে। তবে এই কোর্স থেকে বিভিন্ন সময়ে কেউ বেরিয়ে যেতে পারবে, আবার পরে সময় সুযোগ মতো যোগ দিতেও পারবে। চার বছরের স্নাতক স্তরের কোর্সে এক বছর পর যদি কেউ সাময়িক বা পাকাপাকিভাবে বেরিয়ে যেতে চায় তাহলে তাকে শুধুমাত্র সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। অবশ্যই তার জন্য এক বছরের প্রয়োজনীয় ক্রেডিট (ন্যূনতম মানদণ্ড) পূরণ করতে হবে। একই ভাবে দু' বছরের শেষে ডিপ্লোমা, তিন বছরের শেষে ব্যাচেলর বা স্নাতক ডিগ্রি এবং চার বছরের শেষে অনার্স ডিগ্রি পাবে। 'অ্যাকাডেমিক ক্রেডিট ব্যাংক' স্থাপন করা হবে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন বিষয়ে অর্জিত ক্রেডিট ডিজিটালরূপে তাতে সংরক্ষিত থাকবে। পরবর্তীকালে কেউ তা ব্যবহার করে তাঁর কোর্স শেষ করতে পারবে।

সবকা সাথ সবকা বিকাশ : আর্থ-সামাজিক কারণে পিছিয়ে পড়া ও বঞ্চিত শ্রেণীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। যেমন তপশিলি জাতি,

উপজাতি, পিছিয়ে পড়া জাতি, মহিলা, সংখ্যালঘু, দিব্যাঙ্গ (শেখার ব্যাপারে অক্ষমতা-সহ), বৃহন্নলা, নিম্ন আয় বিশিষ্ট পরিবার, শিশু ভিক্ষুক, অনাথ, শহুরে দরিদ্রদের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা ভাবা হয়েছে এবং সে সবের রূপায়ণ করা হচ্ছে। আর্থ- সামাজিকভাবে বঞ্চিত শ্রেণীদের জন্য 'বিশেষ শিক্ষাঞ্চল' ঘোষণা, তহবিল গঠন, নিঃশুল্ক পঠনপাঠন ও হোস্টেল ব্যবস্থা, ফি মকুব, বৃত্তি প্রদান, ব্রিজ কোর্স চালু, অতিরিক্ত জওহর নবোদয় বিদ্যালয়, কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় ও কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপন এর অন্যতম।

কর্মসংস্থান ও স্বনিযুক্তি : বর্তমান দশকে আমাদের দেশের জনসংখ্যার গড় বয়স বিশ্বের মধ্যে সর্বনিম্ন। জাপানে যেখানে জনসংখ্যার গড় বয়স ৪৮ বছর, চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৩৭ বছর, সেখানে ভারতে ২৯ বছর। ফলে আগামীদিনে বিশ্বে তরুণ জনসংখ্যার যে অভাব হবে তা ভারতের প্রায় পাঁচ কোটি তরুণ সেই ঘাটতি পূরণ করতে পারবে। কিন্তু তাদের কাজের যোগ্য করে তুলতে হবে। তাই জাতীয় শিক্ষা নীতিতে বৃত্তিমূলক শিক্ষার নবীকল্পীকরণ এবং দক্ষতার উন্নয়ন করতে বলা হয়েছে। ২০২৫ সালের মধ্যে অন্তত ৫০ শতাংশ পড়ুয়াকে বৃত্তিমূলক শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা হবে। আগামী দশ বছরের মধ্যে সমস্ত মাধ্যমিক স্কুলকে আইটিআই, পলিটেকনিক এবং স্থানীয় কলকারখানা ও বিভিন্ন উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। স্কুলে 'স্কিল ল্যাব' এবং 'হাব' তৈরি হবে। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সফট স্কিল-সহ বিভিন্ন কৌশলগত দক্ষতার স্বল্পমেয়াদি ট্রেনিঙের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ভারতে বিকশিত বৃত্তিমূলক জ্ঞান যা 'লোক বিদ্যা' নামে পরিচিত, তাকে সময়োপযোগী করে তুলে আনার কথাও বলা হয়েছে।

কর্মসংস্থান বাড়াতে পাঠ্যক্রম ও শিল্পের সমন্বয় সাধন ও স্কুল-কলেজ থেকেই হাতে-কলমে কাজ শেখার জন্য নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। বছরে বিধিবদ্ধভাবে দশদিন স্কুলের ব্যাগ ছাড়াই ক্লাস সিক্স থেকে এইটের বাচ্চারা হাতে-কলমে কাজ শেখার জন্য স্কুলে বা আশেপাশের শিল্প সংস্থায় যাবে। জীবন কৌশল পাঠ্যক্রমও তৈরি করা হয়েছে যা তাদের বাস্তব জীবনে দাঁড়াতে সাহায্য করবে। এতে স্থান পেয়েছে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শিষ্টাচার, নীতিশাস্ত্র ও সততা, প্রেম ও সমবেদনা, নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা এবং যোগ ও প্রাণায়ামের মতো বিষয়।

সংস্কৃত জ্ঞান প্রণালী : 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের' মতো উদ্যোগের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষার যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সংস্কৃতির যে বৈশিষ্ট্য তা যে মূলত সংস্কৃত জ্ঞানভাণ্ডার থেকে উৎসাহিত তা এই নীতিতে সুস্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেজন্য ভারতীয় ধ্রুপদী ভাষা ও সাহিত্যের, বিশেষ করে সংস্কৃত ভাষার যে অমূল্য জ্ঞানপ্রণালী যেমন সংস্কৃত প্রাচীন পুঁথিতে গণিত, ধাতুবিদ্যা, দর্শন, সংগীত, চিকিৎসাবিদ্যা, আর্কিটেকচার, নাটক, কবিতা ইত্যাদি বিষয় যা 'সংস্কৃত জ্ঞান প্রণালী' নামে পরিচিত— তার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য স্কুল ও উচ্চ শিক্ষার সকল স্তরে সংস্কৃতকে ত্রিভাষার অন্যতম একটি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে সমসাময়িক ও প্রাসঙ্গিক উপায়ে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই সংস্কৃত শেখানো ও শেখার সুযোগ থাকছে।

একই সঙ্গে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা তথা আঞ্চলিক ভাষার গুরুত্ব বৃদ্ধি করতে উচ্চশিক্ষায় মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। সমস্ত ভাষাতে শিক্ষণ পদ্ধতি ও প্রিন্ট সামগ্রীর প্রসার ঘটাতে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ভাষা যাতে কোনো বাধা হয়ে না দাঁড়ায় সেজন্য অনুবাদ ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হচ্ছে। এ কারণে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ট্রান্সলেশন অ্যান্ড ইন্টারপ্রেটেশন স্থাপন করা হচ্ছে।

শিক্ষকরাই পরিবর্তনের বাহক : নীতি রূপায়ণে শিক্ষক-শিক্ষিকারাই যে অগ্রণী ভূমিকা নেবেন এবং তাঁরাই যে পরিবর্তনের আধার তা মেনে নিয়ে তাঁদের নিয়োগ, শিক্ষা ব্যতিরেকে অন্য কাজ থেকে মুক্তি, তাঁদের যোগ্যতা ও মেধাকে আরও তীক্ষ্ণ ও শক্তিশালী করে তোলার ব্যবস্থা হচ্ছে। পেশাগত যোগ্যতা বাড়াতে নতুন নতুন উদ্ভাবনী কৌশল ও প্রশিক্ষণের নিরবচ্ছিন্ন সুযোগ থাকছে। স্কুল স্তর থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রতিভার অন্বেষণ, ছোটো-ছোটো প্রকল্পের মাধ্যমে গবেষণার স্বাদ জাগানো এবং শিক্ষার্থীদের আগ্রহ অনুসারে উচ্চতর শিক্ষায় তাদের সঠিক জায়গায় পৌঁছে দেওয়া— এসবই শিক্ষকরা দায়িত্ব নিয়ে করবেন। 'এভরি চাইল্ড ইজ এ স্পেশাল'— এই প্রবাদবাক্যকে বাস্তবায়িত করতে এই জাতীয় শিক্ষানীতি বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেছে যা শিক্ষক-শিক্ষিকারা বাস্তবায়িত করবেন। ছাত্র-ছাত্রীদের বেপরোয়া প্রতিযোগিতা থেকে উদ্ধার করার জন্য এই শিক্ষানীতি এক সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ।

প্রযুক্তির ব্যবহার : একুশ শতকের জ্ঞানশীল সমাজে ভারতের ভূমিকাকে শক্তভাবে প্রতিষ্ঠা করতে প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক ব্যবহার, যন্ত্রশিক্ষার বাড়বাড়ন্ত এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উত্থানের সঙ্গে বিশ্বের চাহিদাকে সামনে রেখে স্কুল স্তর থেকেই প্রযুক্তির ব্যবহার ও শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে। যেসব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ শিক্ষক বা বিশেষজ্ঞের অভাব আছে সেসব স্থানে ওপেন ডিসট্যান্স লার্নিং, অনলাইন বিভিন্ন কোর্সের সুযোগ বৃদ্ধি করা হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় ডিজিটাল পরিকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে। ইন্টারনেট, রেডিয়ো, কমিউনিটি রেডিয়ো, পডকাস্ট, প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত 'ওয়ান ক্লাস ওয়ান টিভি চ্যানেল', দৃষ্টি ও শ্রবণ-প্রতিবন্ধীদের জন্য ই-কনটেন্ট তৈরি করা ইত্যাদি এই পরিকাঠামোর অঙ্গ। একই সঙ্গে বিশ্বব্যাপী দক্ষ লোকেদের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে শিক্ষার্থীরা যাতে ডিজিটাল সাক্ষরতা, কম্পিউটার ভাষা শিক্ষা (কোডিং), ডেটা বিজ্ঞান, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি বিষয়ে সময়োপযোগী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তারও ব্যবস্থা হচ্ছে।

সরকারের ভূমিকা : ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের সব জেলায় অন্তত পক্ষে একটা করে বৃহৎ বহু বিষয়ক উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠা তৈরি করা হবে। ২০৩৫ সালের মধ্যে উচ্চ শিক্ষায় গড় তালিকাভুক্তি ৫০ শতাংশে নিয়ে যাওয়া হবে। শিক্ষাক্ষেত্রের উৎকর্ষতা যেহেতু আর্থিক অগ্রগতির সঙ্গে যুক্ত সেজন্য শিক্ষাখাতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ করা হবে যাতে তা দ্রুত জিডিপির ৬ শতাংশে পৌঁছায়। পরিকাঠামো ও অন্যান্য খাতে এককালীন বিনিয়োগ ছাড়াও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত আর্থিক সহায়তা দরকার। যেমন প্রারম্ভিক শৈশবযত্ন, যথাযথ পুষ্টি ও খাদ্য সরবরাহ করা, বুনিয়াদি সাক্ষরতা ও সংখ্যাজ্ঞানের ক্ষমতা সুনিশ্চিতকরণ, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ক্রমাগত পেশাদারি উন্নতি, গবেষণা, অনলাইন কোর্স ইত্যাদি। কেন্দ্রে মোদী সরকার এই বিনিয়োগ ও আর্থিক সহায়তায় বদ্ধপরিকর। □

পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা ও অর্থনীতির ভরাডুবির জন্য বামফ্রন্ট ও তৃণমূল সরকার দায়ী

আনন্দ মোহন দাস

কোনো রাজ্যে যখন আইনের শাসনের পরিবর্তে শাসকের আইন চলে, তখনই জঙ্গলরাজ কায়েম হয়। জঙ্গলে বিবেক, মনুষ্যত্ব, মানবিকতা ও সভ্যতার ছোঁয়া থাকে না। কেবলমাত্র পাশবিক শক্তি, হিংস্রতার মাধ্যমে ক্ষমতার আস্ফালন ঘটিয়ে দুর্বলের উপর অত্যাচার চলে। বর্তমানে তার জ্বলন্ত উদাহরণ হলো এক সময়ের সাংস্কৃতিক পীঠস্থান পশ্চিমবঙ্গ। এই রাজ্য আইনশৃঙ্খলার অবনতির প্রেক্ষিতে সারা দেশে শীর্ষস্থান দখল করেছে। বামপন্থীরা তাদের শাসনকালে হিংসার যে বীজ বপন করেছিল, তৃণমূলের শাসনে আজ তা মহীরুহে পরিণত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, বিবেকানন্দের দেশে এত হিংসা, সন্ত্রাস ও নারী জাতির অপমান কেন? প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, সারা ভারতে নির্বাচনী হিংসা যখন একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে, তখন পশ্চিমবঙ্গ তার ব্যতিক্রম কেন? পশ্চিমবঙ্গের বাইরে আমাদের গর্ব করে বলার মতো আর কিছু নেই। বরং বঙ্গ সংস্কৃতির বড়াইকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে হিংসাই এখন পশ্চিমবঙ্গের চর্চার বিষয়। তাছাড়া রাজ্যে নিত্যদিনের সঙ্গী রয়েছে কাটমানি, সিন্ডিকেট, বালি, কয়লা মাফিয়া, খুন, নারীধর্ষণ, বোমাবাজি ও সন্ত্রাস। এখানে অপরাধের পরিসংখ্যান কম দেখানোর জন্য থানায় এফআইআর নিতে অস্বীকার করার ঘটনাও ঘটে থাকে। দেখা গেছে সেবার পরিবর্তে রাজনীতি যখন পেশা হিসেবে দাঁড়ায়, তখন টাকার থলি বা মধুভাণ্ড হাতে পেতে দখলদারির লড়াই চলে এবং তার ফলে লাগামছাড়া দুর্নীতি সর্বত্র বিরাজ করে। গত বিধানসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে শতাধিক মানুষ খুন হয়েছে এবং বহু সংখ্যক মানুষ মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। ভোট পরবর্তী হিংসায় বেশ কয়েক হাজার মানুষ বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও সন্ত্রাসের ফলে ঘরছাড়া হয়েছিলেন।

বলতে লজ্জা হয় এই হলো শ্রীরামকৃষ্ণ-বিদ্যাসাগর-রামমোহন- বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গভূমি। রবীন্দ্রনাথ গানের মধ্যে দিয়ে এই বাঙ্গলাকে সোনার বাঙ্গলা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এই বঙ্গেই বন্দেমাতরমের জয়ধ্বনি উদ্‌ঘোষিত হয়েছে। এই বঙ্গভূমি একসময় স্বাধীনতা আন্দোলন ও সংস্কৃতির পীঠস্থান ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় পশ্চিমবঙ্গ আজ রক্তাক্ত ও কলুষিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের হিংসা ও সন্ত্রাসের পরিসংখ্যানে নবতম সংযোজন হলো সন্দেশখালি, যেখানে সন্ত্রাসীদের দাপট অপরাধ জগতের সমস্ত রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। এখানে জেহাদি শক্তি মা-বোনেদের সম্ভ্রম নষ্ট করে নারী জাতিকে অপমান করেছে। সভ্য সমাজের সমস্ত শালীনতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে দেশের সামনে পশ্চিমবঙ্গের ভাবমূর্তি ম্লান করেছে। মুখ্যমন্ত্রী মহিলা হয়েও মহিলাদের প্রতি কোনো মমতা দেখাননি। সন্দেশখালি শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, দেশের লজ্জায় পরিণত হয়েছে। এরা রাজ্যের সম্মানকে ভূলুণ্ঠিত করেছে। এলাকায় বলপূর্বক জনজাতিদের চাষের জমি কেড়ে নিয়ে ভেড়ি বানিয়ে শাসকের ছত্রছায়ায় নিজেদের অর্থের

ফঃ ৩

ইমারত গড়েছে। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষকে শোষণ করে নিজেদের অর্থের ভাণ্ডার গড়ে তুলেছে। সন্ত্রাস সৃষ্টি করে শাজাহান বাহিনী এলাকা হিন্দুশূন্য করার চক্রান্ত করেছে। বেছে বেছে হিন্দু মহিলাদের সম্ভ্রমহানি করা হয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে তারা নিজেদের হাতে আইন তুলে নিয়েছে। এরাই একসময় সিপিএমের নেতা ছিল, আজ তারাই শাসক তৃণমূলের নেতা। শাসক বদলেছে, কিন্তু এদের কীর্তিকলাপ বদল হয়নি।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতেই হয়, কোথায় গেলেন আমাদের সেই তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা। যারা দেশে গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও অসহিষ্ণুতার ধুয়ো তুলে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অহরহ প্রতিবাদ করে থাকেন। এরা সিএএ, আখলাক, হাথরাস কাণ্ড নিয়ে দেশব্যাপী শোরগোল তুলে নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণ করেন। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে এ রাজ্যের হিংসা, গণধর্ষণ, মহিলাদের নিরাপত্তা ও সন্ত্রাস নিয়ে আজ তাঁরা নীরব রয়েছেন। এ রাজ্যের নির্বাচনী হিংসায় বহু মানুষের মৃত্যু হলে বা সন্দেশখালি, হাঁসখালি ও মালদহের মতো ঘটনা ঘটলেও, নারী জাতির অপমান ঘটলেও তাঁরা প্রতিবাদে সোচ্চার হন না। কোনো এক অজানা কারণে এরা পছন্দমাফিক প্রতিবাদে বিশ্বাস করেন। দলীয় স্বার্থে পুলিশকে দলদাসে পরিণত করে তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে না দেওয়ার পরিণতি হলো হিংসা, নারী ধর্ষণ, দখলদারি ও সন্ত্রাস। একই প্রতিফলন দেখা গেল সন্দেশখালিতে যেখানে হিংসা, সন্ত্রাস, গুন্ডারাজ, দখলদারি, মহিলাদের নিরাপত্তা ও গণধর্ষণের মতো পাশবিক অত্যাচারে স্থানীয় মানুষের ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। শাসকদলের মদতে বাহুবলী শাজাহান বাহিনীর উত্থানে স্থানীয় মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। তাই মহিলারা সন্ত্রাস উপেক্ষা করে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন।

সবটাই হলো স্বৈরাচারী শাসন এবং গণতন্ত্রের টুঁটি টিপে একদলীয় শাসন কায়েম করার নিষ্ঠুর প্রয়াস মাত্র। পশ্চিমবঙ্গে শাসকদলের মদতে গণতন্ত্রের অন্তর্জলি যাত্রা শুরু হয়ে গেছে। এরাই আবার গণতন্ত্র বিপন্ন বলে নরেন্দ্র মোদীর আদ্যশ্রাদ্ধ করে থাকেন। রাজ্যের জেলায় জেলায় শাসকদলের মদতে গ্রামেগঞ্জে বোমার পাহাড় তৈরি হয়েছে। আগামী লোকসভা নির্বাচনে হয়তো একই চিত্র লক্ষ্য করা যাবে বলে অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। এই রাজ্যে রাজনৈতিক হিংসা ও সন্ত্রাসের কারণে রাজনীতি আজ কলুষিত হয়ে সমাজবিরোধী ও দুর্বৃত্তের আড্ডা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভোট পরবর্তী হিংসার প্রেক্ষিতে মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে, এখানে আইনের শাসন নেই, শাসকের আইন রয়েছে। এ রাজ্যে জনগণ ও মহামান্য আদালতের রাজ্য পুলিশে আর আস্থা নেই। সেজন্য সর্বত্র কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে শাসকের দুর্নীতির তদন্ত চলছে। পুলিশকে নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে কাজ করতে না দিলে, সমাজে অপরাধ প্রবণতা যে বৃদ্ধি পাবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না এবং তারই পরিণতি হলো এরাজ্যে আইন শৃঙ্খলার অবনতি।

পশ্চিমবঙ্গে হিংসাত্মক কার্যকলাপের মূল কারিগর হলো সিপিএম দল। পঞ্চায়েত ও অন্যান্য নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রতিটি নির্বাচনে হিংসার পরিবেশ সৃষ্টি করা, রাজনৈতিক হত্যা, ভয় ও সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করে হুমকি দেওয়া ও সম্পত্তি ভাঙচুর করা, ভোটে রিগিং ও বুথ দখল করা, ভোটের আগের দিন রাতে বিরোধীদের বাড়িতে হুমকি দিয়ে ভোট প্রদানে বাধা দেওয়া, বিরোধী প্রার্থীদের বাড়িতে হুমকি দিয়ে সাদা খান পাঠানো ইত্যাদি ছিল সিপিএম দলের নির্বাচনী সংস্কৃতি এবং গণতন্ত্রের নামে স্বৈরতন্ত্রের জ্বলন্ত উদাহরণ। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার লিস্টে নাম তুলে দেওয়া এবং ভুতুড়ে ভোটার তৈরি করে জালভোট দেওয়া ছিল সিপিএমের কৌশল। ভোটের নামে রক্তের হোলি খেলে নির্বাচনকে প্রহসনে রূপান্তরিত করা ছিল বামেদের সংগঠিত অপরাধ। নির্বাচন ছাড়াও গ্রামেগঞ্জে হিংসা, চরম সন্ত্রাস, বিরোধীদের ঘরছাড়া, সর্বক্ষেত্রে পার্টির দখলদারি, শিক্ষাক্ষেত্রে দলবাজি, প্রশাসনে দলবাজি এবং সর্বত্র লালসন্ত্রাসে মুড়ে দেওয়ার প্রবণতা ছিল। এমনকী ভূমি সংস্কারের নামে গ্রামেগঞ্জে চাষের জমিতে লালঝান্ডা পুঁতে জমির দখল নেওয়া ছিল সিপিএমের জলভাত। বিগত ৩৪ বছরের অপশাসনের ফলে এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ বামপন্থীদের ফিরিয়ে এনে দ্বিতীয়বার ভুল করবে বলে মনে হয় না। বর্তমান শাসকদল তৃণমূল সেই সিপিএমের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আরও এককদম এগিয়ে গেছে। এই রাজ্যে ভোটের স্বার্থে উভয়েই বাংলাদেশি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গাদের ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড, আধার কার্ড পাইয়ে দিয়ে ভোটার লিস্টে নাম তুলে দেশবিরোধী কাজ করে চলেছে। এদের বদান্যতায় কয়েক কোটি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গাদের বসবাসে এ রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হচ্ছে এবং অর্থনীতিতে প্রভাব পড়েছে। এই আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, দুটি দলের রাজনৈতিক চরিত্র প্রায় এক। সুতরাং জোর দিয়ে বলা যায়, দুটি দলই পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা, আর্থিক অবনতি এবং শিল্পবিরোধী ভাবমূর্তির জন্য সর্বাংশে দায়ী।

পশ্চিমবঙ্গ আজ শিল্প, অর্থনীতি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে পিছনের সারিতে এবং হিংসায় প্রথম স্থানে। পশ্চিমবঙ্গে হিংসা ও সন্ত্রাসের রাজনীতি বন্ধ করতে হলে, যারা ক্ষমতা কায়েম রাখতে মৃতদেহের উপর রাজনীতি করে, তাদের বয়কট করতে হবে এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে সঙ্গে নিয়ে জনমত গড়ে তুলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে। নতুবা ইতিহাসের পাতায় বাঙ্গালি হিংসায় উন্মত্ত এক জাতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে। বলতে দ্বিধা নেই, মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে বেঁচে থাকলে নিশ্চিত অনুতপ্ত হতেন এবং তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি, 'What Bengal thinks today, India thinks tomorrow' ফিরিয়ে নিতেন।

বিগত ৪৬ বছরের বামফ্রন্ট ও তৃণমূলের দীর্ঘ অপশাসনে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও আর্থিক ক্ষেত্রে সর্বনাশ হয়ে গেছে। রাজ্যের শিল্প এখন শ্মশানে পরিণত হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ে শিল্পের কঙ্কালসার চেহারা বেরিয়ে এসেছে। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত শিল্প ও অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল মধ্যগগনে। মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে দেশের শিল্পতালুকের ৩৪ শতাংশ শিল্প এ রাজ্যে ছিল। সেই সময় এ রাজ্য দেশের মধ্যে শিল্পে এক নম্বরে অবস্থান করত। দীর্ঘ অপশাসনে বর্তমানে কারখানার অধিকাংশই বন্ধ হয়েছে বা ধুঁকছে। অনেকেরই রুজিরোজগার ও ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে। এদের আমলে ছোটো বড়ো প্রায় ৫৬ হাজার শিল্প কারখানার শ্মশান যাত্রা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ বামপন্থী রাজনীতির যূপকাষ্ঠে শিল্পকে বিসর্জন দিয়ে এ রাজ্যের যুবক যুবতীদের ভবিষ্যৎ ও অর্থনীতিকে জলাঞ্জলি দিয়েছে।

তদানীন্তন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিপিএমের দেখানো পথে নন্দীগ্রাম আন্দোলন এবং সিঙ্গুরে কৃষি জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে রাজ্যব্যাপী তীব্র আন্দোলন, বিক্ষোভ ও অনশন শুরু করে দিলেন। সিঙ্গুরে চাষের জমি দখল করে টাটার গাড়ি কারখানা করার প্রতিবাদে মমতা বিভিন্ন ভাবে রাজ্যের মানুষকে খেপিয়ে তুলে রাজনৈতিক ফায়দা তুললেন এবং সিপিএমের বিরুদ্ধে কৃষকবিরোধী তকমা এঁটে দিলেন। এই আন্দোলনের ফলে কয়েকশো কোটি টাকা ক্ষতি করে টাটা রাতারাতি পাততাড়ি গুটিয়ে গুজরাটে ন্যানো গাড়ির কারখানা খুলতে চলে গেলেন। টাটার মতো সংস্থার অপ্রীতিকর অবস্থা দেখে দেশের শিল্পপতিরা পশ্চিমবঙ্গের নেতিবাচক দিকটি আবার উপলব্ধি করলেন। দেশের শিল্পপতিদের কাছে পশ্চিমবঙ্গ পুনরায় শিল্প বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত হলো। মমতা এই আন্দোলনে উৎসাহিত হয়ে অপদার্থ বামফ্রন্ট সরকারকে অপসারণ করতে পরিবর্তনের ডাক দিলেন। মানুষ অত্যাচারী

পশ্চিমবঙ্গের ভাবমূর্তি ফেরাতে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে এবং সব ধরনের ধ্বংসাত্মক রাজনীতির বিরুদ্ধে সকলকে রুখে দাঁড়াতে হবে।

বামফ্রন্ট শাসনে তিতিবিরক্ত হয়ে পরিত্রাণের আশায় ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট সরকারকে বিদায় দিলেন। কিন্তু কোনোরকম পরিবর্তন না হয়ে অল্পদিনের মধ্যেই জনগণের মোহভঙ্গ হলো। সেই বামেদের একই ট্র্যাডিশন তৃণমূলের শাসনকালে আরও বৃদ্ধি পেল। বরং বর্তমান শাসক বামপন্থী কীর্তিকলাপকে আরও বেশি রপ্ত করে পশ্চিমবঙ্গে আরও বেশি খুন, হিংসা ও সন্ত্রাসের আশ্রয় নিল। সিপিএমের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দখলদারির নামে ধর্ষণ, খুনোখুনি, বোমাবাজি, দলবাজি, সিন্ডিকেট, কাটমানি, শিক্ষা-সহ সর্বত্র দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হলো।

বর্তমানে দুর্নীতির অভিযোগে শাসকদলের নেতা, মন্ত্রী ও কর্মীরা গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গেলেন। আদালতের নির্দেশে সমস্ত অভিযোগের তদন্ত কেন্দ্রীয় এজেন্সি সিবিআই, ইডির হাতে গেল। সমস্ত দিক থেকে শাসক দল দুর্নীতির জালে জড়িয়ে নাস্তানাবুদ হয়ে গেল। দুর্নীতি, কাটমানি, সিন্ডিকেট, হিংসা, সন্ত্রাস ও আইনশৃঙ্খলার অবনতির কারণে সারা দেশে এ রাজ্যের ভাবমূর্তি আরও বেশি খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ধ্বংসাত্মক রাজনীতি দেখে কোনো শিল্পপতি বিনিয়োগ করলেন না। দীর্ঘ ১২ বছরে কোনো শিল্পপতি এ রাজ্যে শিল্প স্থাপনে এগিয়ে এলেন না এবং রাজ্যে শিল্পে নাভিশ্বাস উঠে গেল। সিপিএম রাজত্বের অপশাসনের পুনরাবৃত্তি ঘটল। মমতা ব্যানার্জী বুনিয়াদি উন্নয়নের পথে না গিয়ে রাজত্ব কায়েম রাখতে ভোটের স্বার্থে পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি শুরু করে দিলেন। তিনি জনগণের পরিত্রাণের ব্যবস্থা না করে, ত্রাণের রাজনীতি আরম্ভ করলেন। শিল্পবিহীন রাজ্যে বেকারত্বের জ্বালা মেটাতে না পেরে বাঙ্গালিরা অন্য রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে চলে গেলেন। মুখ্যমন্ত্রী আয়ের উৎস সৃষ্টি না করে ক্ষমতা কায়েম রাখতে মেলা, খেলা, উৎসবে পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতিকে প্রাধান্য দিলেন। তিনি বামফ্রন্টের ১,৮৬,০০০ কোটি টাকার ঋণকে প্রায় ৭ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছে দিলেন। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মাথায় বিপুল পরিমাণ ঋণের বোঝা চাপিয়ে এবং শিল্পের কবর খুঁড়ে সব দিক থেকে বামফ্রন্টের অপশাসনকে ছাপিয়ে গেলেন। বামফ্রন্টের মতো নিজের অক্ষমতা ঢাকতে কেন্দ্রের উপর দোষারোপ করে টাকা দিচ্ছে না বলে জনগণকে খেপিয়ে রাখলেন। অস্বীকার করার উপায় নেই এই রাজ্য শুধু শিল্প নয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আর্থিক ভাবেও সর্বভারতীয় স্তরে পিছনের সারিতে চলে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের ভাবমূর্তি ফেরাতে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে এবং এই ধরনের ধ্বংসাত্মক রাজনীতির বিরুদ্ধে সকলকে রুখে দাঁড়াতে হবে। আগামী লোকসভা নির্বাচনে এদের অপশাসন থেকে মুক্তি পেতে এবং রাজ্যের ভাবমূর্তি ফেরাতে তৃতীয় বিকল্প শক্তির উত্থানে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে নতুবা নেতিবাচক রাজনীতির অতল গহ্বরে এ রাজ্য আরও তলিয়ে যাবে। □

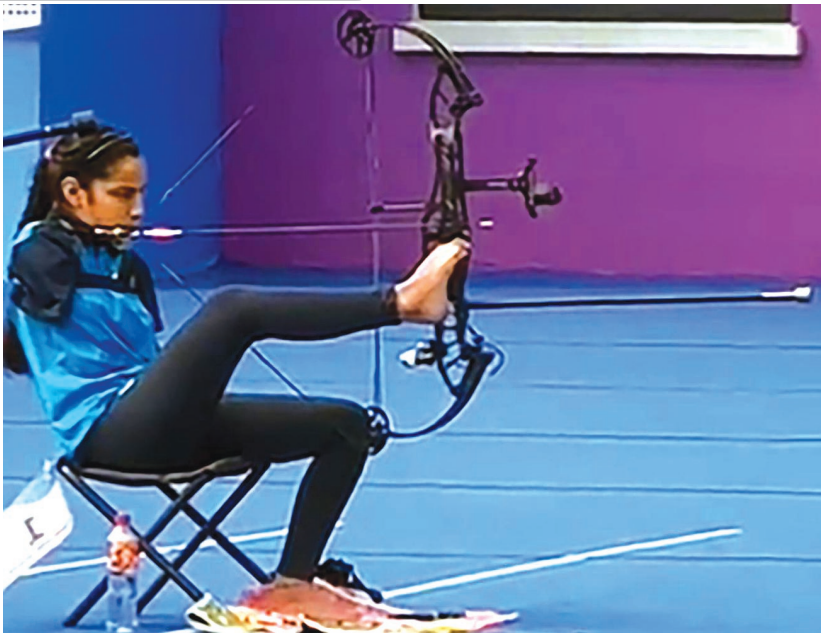

কৃতী ভারতীয় প্যারা-আর্চার শীতল দেবী।

প্রতিবন্ধকতাকে পিছনে ফেলে ভারতীয় মেয়েদের সাফল্য

নিবেদতা কর

বৈদিক যুগে ভারতবর্ষে উপমহাদেশে মহিলাদের সমাজে সম্মান ছিল ষোলোআনা। সেই যুগের মহিলা বলতে আমাদের এখনো মুখে মুখে ঘোরে গার্গী, অপালা, লোপামুদ্রা, মৈত্রেয়ীদের নাম, যারা ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ। তখনকার ঋষিকারা বেদের সূক্ত রচনা করতেন। কেউ কেউ ধনুর্বিদ্যা, রথ চালানো, অশ্বারোহণ, অসি চালনায় ছিলেন পারদর্শী। কিন্তু ইসলামিক যুগ থেকে ভারতে নারীদের অবস্থানের অবনতি ঘটে। কন্যা ভ্রূণ হত্যার মতো অভিশাপ সমাজে নেমে আসে। একসময় মেয়ে হয়ে জন্মানোটাই অনেক মহিলার কাছে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ প্রায় সব রকম প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে জীবন সংগ্রামে টিকে থাকতে তৈরি হয়ে যায়। অঙ্গনার পাতায় ভারতীয় সেই মহিলাদের অনবদ্য অবদান তুলে ধরতে চাই যারা জন্মগত প্রতিবন্ধকতাকে হেলায় হারিয়ে ভারতের নাম বিশ্ব দরবারে উজ্জ্বল করেছে। তারা দেখিয়ে দিয়েছে নারী ইচ্ছে করলে সবরকম প্রতিবন্ধকতাকে জয় করতে পারে।

প্যারা এশিয়াডে ভারত ২০২৩ সালে বৃহত্তম দল পাঠিয়েছিল, যেখানে ৩০৩ জন খেলোয়াড় (১৯১ পুরুষ এবং ১১২ জন মহিলা) অংশ নিয়েছিলেন। ১১১টি পদকের মধ্যে, মহিলা খেলোয়াড়রা ৪০টি পদক অর্জন করেছিলেন, অর্থাৎ পদক তালিকার ৩৬ শতাংশ। এখানে এশিয়ান প্যারা গেমস ২০২৩-এ বিশেষভাবে সক্ষম ভারতীয় মহিলা পদক বিজয়ীদের উল্লেখ করা হলো :

প্যারা-আর্চারি : শীতল দেবী— মহিলাদের ব্যক্তিগত কম্পাউন্ড— স্বর্ণ, শীতল দেবী, রাকেশ কুমার— মিশ্র দল কম্পাউন্ড— গোল্ড। শীতল দেবী, সরিতা— মহিলা ডাবলস কম্পাউন্ড— রৌপ্য।

প্যারা-অ্যাথলেটিক্স : রক্ষিতা রাজু— ১৫০০ মিটার T11-সোনা, জীবনজি দীপ্তি— ৪০০ মিটার T20— সোনা, নিমিশা চাক্কুঙ্গালপারম্বিল— লং জাম্প T47— সোনা, ললিতা কিল্লাকা— ১৫০০ মিটার T11— রৌপ্য, সিমরান— ১০০ মিটার T12-– রৌপ্য, সিমরান— ২০০ মিটার T12— রৌপ্য, ভাগ্যশ্রী যাদব— শট পাট— F34— রৌপ্য, পূজা— ডিসকাস থ্রো F54/55, রৌপ্য, লক্ষ্মী— ডিসকাস থ্রো F37/38— ব্রোঞ্জ একতা ভিয়ান— ক্লাব নিক্ষেপ F32/51-ব্রোঞ্জ।

প্যারা-ব্যাডমিন্টন : থুলাসিমাথি মুরুগেসান-SU5— সোনা, মানসী যোশী/ থুলসিমাথি মুরুগেসান-মহিলাদের দ্বৈত SL3-SU5-রৌপ্য, প্রমোদ ভগত/মনীষা রামদাস-মিশ্র দ্বৈত SL3-SU5-ব্রোঞ্জ, নীতেশ কুমার/থুলাসিমাথি মুরুগেসান-মিশ্র দ্বৈত SL3-SU5- ব্রোঞ্জ, মানসী জোশী- SL3- ব্রোঞ্জ, বৈষ্ণবী পুনয়ানি- SL4- ব্রোঞ্জ, মনদীপ কৌর- SL3- ব্রোঞ্জ, শিবরাজন সোলাইমালাই/নিথ্যা শ্রী-মিশ্র দ্বৈত SH6- ব্রোঞ্জ, নিথ্যা শ্রী সিভান- SH6- ব্রোঞ্জ, মনীষা রামদাস- SU5- ব্রোঞ্জ, মনীষা রামদাস/মনদীপ কৌর-মহিলাদের দ্বৈত SL3-SU5- ব্রোঞ্জ, নিত্যা শ্রী সিভন রচনা প্যাটেল- মহিলাদের দ্বৈত SH6- ব্রোঞ্জ।

দাবা : হিমাংশী রাঠি— মহিলাদের ব্যক্তিগত মান VI-B1- ব্রোঞ্জ, মহিলা দল র‍্যাপিড ভি1-বি1-ব্রোঞ্জ। **ক্যানু :** প্রাচী যাদব- KL2- সোনা, প্রাচী যাদব- ভিএল 2-রৌপ্য। **জুডো :** কোকিলা-৪৮ কেজি জে-২-ব্রোঞ্জ। **প্যারা-পাওয়ারলিফটিং :** জয়নাব খাতুন—৬১ কেজি-রৌপ্য, রাজ কুমারী—৬১ কেজি-ব্রোঞ্জ। **রোয়িং :** অনিতা/নারায়ণ কঙ্গনপল্ল- PR3 মিক্সড ডাবলস্ স্কালস— রৌপ্য। **প্যারা-শ্যুটিং :** অবনী লেখারা— ১০ মিটার এয়ার রাইফেল স্ট্যান্ডিং SH1— সোনা, রুবিনা ফ্রান্সিস— ১০ মিটার এয়ার পিস্তল SH1- ব্রোঞ্জ। **প্যারা-তাইকোয়ান্দো :** অরুণা তানওয়ার— K-৪৪-৪৭ কেজি— ব্রোঞ্জ। **প্যারা-টেবিল টেনিস :** ভাবিনা হাসমুখভাই প্যাটেল— মহিলাদের একক ক্লাস 4—ব্রোঞ্জ।

শেষে বলি, কাশ্মীরের ১৭ বছর বয়সি কিশোরী শীতল দেবীকে নিয়ে, যিনি ভারত যে ধনুর্বিদ্যার পুণ্যভূমি অর্থাৎ ভারতে ভগবান শ্রীরাম, অর্জুনের মতো বীর, রতি দেবী থেকে মা দুর্গা ধনুর্বিদ্যায় কেমন পারদর্শী ছিলেন তা আমাদের আরও একবার মনে করতে বাধ্য করেছেন। ভারতের এই প্যারা-তিরন্দাজ ইতিহাস তৈরি করেছেন যদিও এর আগে প্যারা এশিয়াডে তিনি দুটো সোনা ও একটি রুপো জিতেছিলেন। তবে এই বিশ্ব জয়ের মাধ্যমে তিনি প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। শীতলদেবী দুটি হাত না থাকা সত্ত্বেও দাঁত ও পা দিয়ে তিরন্দাজি করে ভারতীয় মহিলাদের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে গেছেন। নারী যেন এই রকম অনুপ্রেরণা নিয়ে তার সব প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে পারে— এই আমাদের কামনা। □

মোদী সরকারের নেতৃত্বে ভারতের প্রতিরক্ষা শক্তি বৃদ্ধি

কর্নেল ড. কুণাল ভট্টাচার্য

২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী পদে নরেন্দ্র মোদী আসীন হওয়ার পরবর্তী এক দশক ধরে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্র শক্তিশালী হয়ে ওঠার সঙ্গে ভারতের সশস্ত্র বাহিনী আধুনিক অস্ত্রসম্পন্ন, পুনর্গঠিত ও দক্ষ যুদ্ধশক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

সার্জিক্যাল স্ট্রাইক : উরিতে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চালায়। ২৮-২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৬-এ হওয়া এই কর্মকাণ্ড সারা বিশ্বে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী সম্পর্কে ধারণা বদলে দিয়েছে। এই ভারত এক নতুন ভারত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে যে দেশ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করে এবং শত্রু অঞ্চলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সন্ত্রাসবাদ খতমের লক্ষ্যে সংকল্পবদ্ধ। ভারতকে রক্তাক্ত, ছিন্নভিন্ন করার উদ্দেশ্যে শত্রু দেশের মাটি থেকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত সন্ত্রাসবাদকে শেষ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাসীদের আস্তানা এবং তাদের নিয়ন্ত্রক ও প্রশিক্ষণদাতা পাক বাহিনীরও সার্জিকাল স্ট্রাইকে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। অতীত অবস্থান পরিবর্তিত হয়ে মোদী সরকারের অধীনে ভারতের ঘোষিত নীতি হলো যে পাকিস্তান যদি ভারত-বিরোধী হিংসা ও নাশকতা থেকে বিরত না হয়, তবে ভারতীয় সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণরেখা অতিক্রম করে তা দমনে পিছপা হবে না।

শত্রুর শক্ত ঘাঁটিতে প্রবেশ করে বিমান হামলা : ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯-এ পুলওয়ামায় জইশ-ই-মহম্মদের সন্ত্রাসী হামলায় ৪০ জন সি.আর.পি.এফ জওয়ান বীরগতিপ্রাপ্ত হন। মোদী সরকার এই হামলার প্রতিশোধ নিয়েছে। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর ছাড়িয়ে পাকিস্তানের মূল ভূখণ্ডের বালাকোটে জইশের সবচেয়ে বড়ো সন্ত্রাসী শিবিরে ২০১৯-এর ২৬ ফেব্রুয়ারি এয়ার স্ট্রাইক চালায় ভারত, প্রতিরক্ষাগত পরিভাষায় যা ছিল— 'নন-মিলিটারি প্রিয়েম্পটিভ অ্যাকশন'। এতে সন্ত্রাসবাদীদের পাশাপাশি তাদের প্রশিক্ষক ও সিনিয়র জঙ্গি কমান্ডার নিহত হয়।

ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়াল : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বীরগতিপ্রাপ্ত ভারতীয় সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য জাতীয় ওয়ার মেমোরিয়াল (National War Memorial) জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন। সেনাবাহিনীর সকল সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসাবে, যাঁরা স্বাধীনতার পর থেকে দেশের জন্য আত্মবলিদান করেছেন, এই ওয়ার মেমোরিয়ালটিতে তাদের সকলের নাম লেখা আছে। সরকারি ঘোষণা অনুসারে, এই স্মৃতিসৌধটি স্বাধীন ভারতের সেই ২৬,০০০ বীরগতিপ্রাপ্ত সেনাদের জন্য যাঁরা দেশ রক্ষায় কোনো না কোনো যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন। এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো 'নিকট আত্মীয় অনুষ্ঠান (Next of Kin)' যা প্রতি সন্ধ্যায় 'ত্যাগ চক্রে' যাদের নাম লেখা আছে তাদের স্মরণ করার জন্য অনুষ্ঠিত হয়।

OFB-র আধুনিকীকরণ : ২০২১ সালের ১৫ অক্টোবর বিজয়া দশমী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে নয়াদিল্লির ডিআরডিও ভবনে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি বোর্ডের পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয় এবং সাতটি নতুন

প্রতিরক্ষা সংস্থা আত্মপ্রকাশ করে। সারা দেশে ৪১টি অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি সহ অস্তিত্বসম্পন্ন অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি বোর্ড রূপান্তরিত হয় সাতটি প্রতিরক্ষা পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিঙে। ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ৩০৯ বছর পর ১ অক্টোবর ২০২১ থেকে বিলুপ্ত হয়ে নবরূপে ঘটলো তার আবির্ভাব। এই কর্পোরেশনগুলি সম্পূর্ণভাবে সরকারের মালিকানাধীন। প্রতিরক্ষা গবেষণা সংক্রান্ত R & D বাজেটের পঁচিশ শতাংশ রাখা হয়েছে শিল্প, ডিফেন্স স্টার্ট-আপ এবং গবেষণায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য। সশস্ত্র বাহিনীকে তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য পেতে সহায়তা করার জন্য 'ডিফেন্স ইনোভেশন স্টার্ট-আপ চ্যালেঞ্জ'-এর মতো অনন্য প্রতিযোগিতা চালু করা হয়েছে। প্রতিরক্ষা সামগ্রী রপ্তানি ২০১৪-'১৫ সালের ১,৯৪১ কোটি টাকা থেকে ৩৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০-'২১ সালে ৮,৪৩৪ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। এখন ভারতে তৈরি প্রতিরক্ষা সামগ্রী ৮৪টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে।

'চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ' নিয়োগের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত : একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে মোদী সরকার স্বাধীনতার পর প্রথমবার 'দ্য চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ' নিয়োগ করেছে। এর আগে প্রতিরক্ষার তিন বিভাগের সমন্বয় করতেন প্রতিরক্ষা সচিব, যিনি সিভিল সার্ভিস উত্তীর্ণ ও সেই চাকরির অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। সেনাবাহিনীতে কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত, সরাসরি সেনা ও কৌশলগত ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তির মাধ্যমেই সেনাবাহিনীর (স্থল, নৌ ও বিমান) তিনটি অংশের মধ্যে সমন্বয়ের বিষয়টি ছিল বহুল প্রতীক্ষিত। ২০১৪-র পর প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এরকম একাধিক সংস্কার সাধিত হয়েছে, যা ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এই সিদ্ধান্তগুলির বাস্তবায়নের ফলে সেনাবাহিনীর সকল ক্ষেত্রে সমন্বয় জোরদার হয় এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহারও শুরু হয়। জরুরি প্রয়োজনে খুচরো যন্ত্রাংশ ও গোলাবারুদ কেনার ক্ষমতাও সেনাবাহিনীকে দেওয়া হয়েছে। এখন যে কোনও প্রয়োজনে সদর দফতর ৩০০ কোটি টাকা পর্যন্ত কেনাকাটা করতে পারে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের ২,০০০ কোটি টাকা পর্যন্ত প্রতিরক্ষা চুক্তির জন্য মন্ত্রীসভার অনুমোদনের প্রয়োজন নেই।

সেনাবাহিনীতে নারী শক্তির ক্ষমতায়ণ : ৫৫৭ জন মহিলা অফিসার সেনাবাহিনীতে স্থায়ীভাবে কমিশনড্ হয়েছেন। প্রথমবারের মতো, সেনাবাহিনীর মিলিটারি পুলিশ বিভাগে ৮৩ জন মহিলা জওয়ান নিযুক্ত হয়েছেন। কর্নেল পদে পদোন্নতি পেয়েছেন পাঁচ জন মহিলা অফিসার। ক্যাপ্টেন অভিলাষা বারাক হলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রথম নারী যুদ্ধবিমান চালক। ২০১৯ সালের গণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে আর্মি সার্ভিস কর্পসের নেতৃত্বদানকারীনী ক্যাপ্টেন ভাবনা কস্তুরীর নাম আগামীদিনের নারী সশক্তিকরণের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। মহিলাদের নিয়োগের জন্য পুনের ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমির দরজা খুলে দিয়েছে নরেন্দ্র মোদীর সরকার।

ওয়ান র‍্যাঙ্ক ওয়ান পেনশন (ও. আর. ও. পি) : অন্যতম

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, মোদী সরকার ওয়ান র‍্যাঙ্ক ওয়ান পেনশন কার্যকর করেছে, যা দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত ছিল। এর আওতায় ২০.৬ লাখ পেনশনভোগী এক্স-সার্ভিসম্যান (অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক) বা তাদের পরিবারের সদস্যদের বকেয়া পেনশন দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে সরকারের বার্ষিক ব্যয় ৭,১২৩ কোটি টাকা। এর সঙ্গে শুরু হয় 'স্পর্শ স্কিম', যার অধীনে এই পেনশনভোগীরা কোনও মধ্যস্বত্বভোগীর জড়িত না হয়ে সরাসরি তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে তাদের প্রাপ্য অর্থ পাচ্ছেন। এই স্পর্শ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ২০২১-'২২ সালে ৫ লক্ষেরও বেশি পেনশনভোগী পেয়েছেন ১১,৬০০ কোটি টাকা।

ভারতে তৈরি প্রথম দেশীয় বিমানবাহী রণতরী : স্বাধীনতার ৭৫ বছরে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথম দেশীয় বিমানবাহী রণতরী আই.এন.এস বিক্রান্তকে নৌবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, 'আজ, এখানে কেরালার উপকূলে, প্রতিটি ভারতীয় একটি নতুন ভবিষ্যতের ভোরের সাক্ষী হচ্ছে। এটি একবিংশ শতাব্দীতে ভারতের কঠোর পরিশ্রম, প্রতিভা ও প্রতিশ্রুতির সাক্ষ্য। যদি লক্ষ্য দূর, যাত্রা দীর্ঘ, সাগর এবং চ্যালেঞ্জ হয় অসীম, তাহলে ভারতের উত্তর 'বিক্রান্ত'। স্বাধীনতার মহোৎসবের অতুলনীয় অমৃত হলো বিক্রান্ত। বিক্রান্ত হলো ভারতের স্বনির্ভর হওয়ার এক অনন্য প্রতিচ্ছবি। মুম্বইয়ের এই অনুষ্ঠানে আই. এন. এস কালভারী নামক একটি Scorpene শ্রেণীর সাবমেরিন মোদীজীর হাতে কমিশনড্ হয়। এই ধরনের পাঁচটি সাবমেরিন নৌবাহিনীকে অর্পণের প্রকল্প

গৃহীত হয়েছে।

ত্রাণ ও উদ্ধার কাজের অগ্রভাগে সেনাবাহিনী : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শাসনকালে সেনাবাহিনীর একটি অন্যরূপ সাধারণ মানুষের সামনে এসেছে। এই ভূমিকা ছিল ত্রাণ ও উদ্ধারের। অপারেশন গঙ্গার অধীনে, ভারতীয় বিমান বাহিনী রাশিয়ার আগ্রাসনের মুখোমুখি হওয়া ইউক্রেন থেকে ২,৪৫৭ জন ভারতীয় নাগরিককে ভারতে ফিরিয়ে আনে। এর জন্য C-17 বিমান ১৭ বার উড়েছে। ২০২১ সালে, ভারতীয় বিমান বাহিনী সফলভাবে ৫৭৯ জন ভারতীয় নাগরিককে আফগানিস্তান থেকে উদ্ধার করে। অপারেশন মৈত্রীর অধীনে, ২০১৫ সালে নেপালে ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের পরে বিমান বাহিনী ত্রাণ সরবরাহ করে এবং সেখানে আটকে পড়া বহু লোককে উদ্ধার করে। বিমান বাহিনীর অসংখ্য হেলিকপ্টার ১,৬৩৮টি যাত্রা করে প্রায় ৬,০০০ জনকে উদ্ধারে সক্ষম হয়। যখন করোনার প্রথম ঢেউ আসে, তখন বিমানবাহিনী এবং ভারতীয় নৌবাহিনী চীন এবং অন্যান্য দেশ থেকে ৪২,০০০ জন বিদেশি এবং ভারতীয়কে উদ্ধার করে।

উৎসবের মরসুমে সীমান্ত এলাকায় উপস্থিতি : দীপাবলী ও রক্ষাবন্ধন উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সর্বদা ভারতের সীমান্ত অঞ্চলগুলি বিশেষত জম্মু, কাশ্মীর ও সিকিম ইত্যাদির দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলসমূহ পরিদর্শন করেন এবং ভারতীয় সৈন্যদের সঙ্গে সেই দিনটি অতিবাহিত করেন। সিয়াচেন ও সিকিমের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রহরারত ও কর্মরত সৈন্যদের জন্য এটি বিশেষ করে একটি দুর্দান্ত নৈতিক উন্নতিকারক ও উৎসাহবর্ধক পদক্ষেপ। রক্ষাবন্ধনের দিনটিতেও তিনি সৈন্যদের সঙ্গে সময় কাটাতে পছন্দ করেন এবং যে ইউনিটগুলিতে যান সেগুলিতে সর্বদা কিছু উপহার দান করেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্ব, সশস্ত্র বাহিনীর অবদান ভারত সম্পর্কে বিশ্ব ধারণাকে বদলে দিয়েছে : এটি কোনো ছোটো মাপের লক্ষ্য অর্জন নয়। আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী এতটাই বিশাল স্বীকৃতি অর্জন করেছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি বড়ো দেশ বর্তমানে ভারতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে চায়। সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি সমগ্র জাতির শ্রদ্ধা রয়েছে এবং তারা নিরাপদ হাতে রয়েছে বলে সন্তুষ্ট বোধ করে। সাম্প্রতিক চীন-ভারত অচলাবস্থার সময় ভারতীয় সেনা অফিসার এবং কর্মীদের যে ক্যারিশম্যাটিক কাজ প্রত্যেক ভারতীয়ের মাথা উঁচু করে দিয়েছে। ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের যুব-সম্প্রদায়ের অনুপ্রেরণার উৎস। যদি এই দেশ নিরাপদ থাকে, তবে তা আমাদের সাহসী সৈন্য এবং তাদের আত্মত্যাগের কারণে।

অগ্নিপথ স্কিম ঃ অগ্নিপথ স্কিম হলো ১৪ জুন, ২০২২ তারিখে ভারত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এবং ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর থেকে বাস্তবায়িত একটি প্রকল্প। ভারতীয় নৌবাহিনী, স্থল বাহিনী ও বিমানবাহিনীতে সমস্ত নিয়োগপ্রার্থীকে চার বছরের জন্য নিয়োগ করা হবে। স্কিমটি সাড়ে ১৭ থেকে ২১ বছর বয়সি পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের জন্য। এই স্কিমের মাধ্যমে বছরে দু'বার নিয়োগ চলবে। অগ্নিপথ স্কিমটি সামরিক বাহিনীতে যোগদানের একটি অন্যতম পথ। ভারত সরকার এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতি বছর ৪৫,০০০ থেকে ৫০,০০০ নতুন সেনাকর্মী নিয়োগের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

মোদী সরকার ভারতকে 'প্রতিরক্ষা উৎপাদন কেন্দ্র বা ডিফেন্স ম্যানুফ্যাকচারিং হাব'-এ পরিণত করার পরিকল্পনা করেছে : ভারতকে প্রতিরক্ষা রপ্তানিকারক দেশ হিসাবে গড়ে তোলার সংকল্প এমন সময়ে গৃহীত হয় যখন দেশটি বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম অস্ত্র আমদানিকারীতে পর্যবসিত হয়েছিল।

প্রতিরক্ষা সামগ্রী রপ্তানিতে নয়াদিল্লির অভিপ্রায় ও ২০১৪ পরবর্তী অধ্যায়ে সেই রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে উচ্চকাঙ্ক্ষা তার ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক প্রভাবের একটি অন্যতম চিহ্ন, কারণ এটি তার অভ্যন্তরীণ শিল্পে বিনিয়োগ আকর্ষণের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা পরিকাঠামো বা ডিফেন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারের বিপুল উন্নয়নে সহায়ক হয়। 'আত্মনির্ভর ভারত' প্রকল্পের অধীনে বর্তমান ভারত সরকার প্রতিরক্ষা খাতে দেশকে স্বনির্ভর করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং ২০২৪ সালের মধ্যে ২৫,০০০ কোটি টাকার প্রতিরক্ষা রপ্তানি অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণও করেছে। প্রতিরক্ষা এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে প্রযুক্তি, বাজার ও ব্যবসা সবচেয়ে জটিলতম রূপ পরিগ্রহ করেছে। প্রতিরক্ষা বাজারের এহেন জটিলতা সত্ত্বেও ভারত গত ৮-৯ বছরের মধ্যে তার প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রকে সম্যকরূপে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম হয়েছে। প্রতিরক্ষা স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে গৃহীত প্রতিরক্ষা নীতির পরিণামে শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন সম্ভবপর হয়েছে। ■

মোদী সরকারের নারী ক্ষমতায়ন

নারী সুরক্ষা, মহিলা সংরক্ষণ আইন

দেবযানী ভট্টাচার্য

এলিজাবেথ ক্যাডি স্ট্যানটন ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শুরু হওয়া আমেরিকার উইমেন্স রাইটস্ মুভমেন্টের পুরোধা এবং সেনেকা ফলস্ কনভেনশনের প্রাণস্বরূপিনী নারীশক্তি। আমেরিকার নারীমুক্তি আন্দোলন প্রকৃত অর্থে শুরুই হয়েছিল তাঁর কণ্ঠে, উদ্যোগে, সংগঠনে, লেখনীতে। এহেন এলিজাবেথ মনে করতেন সাহসই নারীর সর্বোত্তম সুরক্ষা। দ্য বেস্ট প্রোটেকশন এনি ওম্যান ক্যান হ্যাভ ইজ কারেজ—বলেছিলেন তিনি। তবে কিনা সাহসিনী নারীরত্নের অভাব ভারতবর্ষে ছিল না কোনোকালেই। এমনকী ইসলামি শাসনের ঘোর অন্ধকারে এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের জাঁতাকলে পড়েও নানা সময়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন এদেশের সাহসিনীরা—কখনও মাতৃরূপে, কখনও স্ত্রীর কর্তব্যপালনে, কখনও-বা স্বমহিমায়। এলিজাবেথের জন্মের ৪০/৪৫ বছর আগে রাঢ়বঙ্গে চুয়াড় বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বঙ্গদেশের এমনই এক সাহসিনী—রাণী শিরোমণি। আমেরিকার নারীরা যখন স্বাধিকারের লড়াই শুরুই করেননি, ভারতের অনেক নারী তার অনেক আগে থেকেই ঔপনিবেশিক শত্রুশাসকের বিরুদ্ধে লড়ছিলেন স্বাভিমান ও সার্বভৌমত্বের লড়াই। তবে কিনা তাঁরা ছিলেন ব্যতিক্রমী মহীয়সী! তাঁদের ব্যক্তিত্ব-বিচ্ছুরণের আভা দেশের সমস্ত নারীদের স্পর্শ করলেও অন্তরে সে আভাকে ধারণ করে উঠতে ভারতবর্ষের সাধারণ নারী আজও পারেনি। আর সেই না পারার কারণেই একবিংশ শতাব্দীর প্রথম এক-চতুর্থাংশ প্রায় পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও নারীসুরক্ষার বিষয়টি রয়ে গিয়েছে ভারত দেশের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় হিসেবে। নারী সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে ২০২৩ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর দেশের সংসদে পাশ হয়ে গিয়েছে 'নারীশক্তি বন্দন অধিনয়ম' তথা 'দ্য কনস্টিটিউশন (১০৬ নম্বর সংশোধনী) উইমেন রিজার্ভেশন অ্যাক্ট, ২০২৩' বা মহিলা সংরক্ষণ বিল।

এই আইনের দ্বারা ভারতের লোকসভা এবং রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকতে চলেছে ৩৩% আসন। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন ভারতবর্ষে নারীর যথোপযুক্ত সম্মান বজায় রাখার বিষয়টিকে যে সর্বাগ্রে ও সর্বপ্রথমে রাখা হবে সেই বার্তা দিতেই বুঝি বা গণেশ চতুর্থী তিথিতে উদ্বোধিত নবনির্মিত সংসদ ভবনে পাশ হওয়া সর্বপ্রথম আইনই এই মহিলা সংরক্ষণ বিল। দেশের গণতান্ত্রিক পরিসরটিতে মহিলাদের সসম্মান প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে যে প্রমথেশের মতো রাখা হবে সর্বাগ্রে, সেই বার্তা গিয়েছে স্পষ্ট।

তবে ২০৩০ এর দশকের আগে ৩৩% সংরক্ষণের এই ব্যবস্থাটি কার্যকর হবে না, কারণ সংরক্ষণটি চালু হবে ডিলিমিটেশনের ভিত্তিতে। সংবিধানের ১০৬ নং সংশোধনী যে সকল নতুন ধারা সংবিধানে যুক্ত করেছে তার অন্যতম হলো (334A) যে ধারা অনুযায়ী "334A. (1) Notwithstanding anything in the foregoing provision of this Part of Part VIII, the provisions of the Constitution relating to the reservation of seats for women in the House of the People, the Legislative Assembly of a State and the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi shall come into effect after an exercise of delimitation is undertaken for this purpose after the relevant figures for the first census taken after commencement of the Constitution (One Hundred and Sixth Amendment) Act, 2023 have been published and shall cease to have effect on the expiration of a perod of fifteen years from such commencement..." অর্থাৎ পরবর্তী জনগণনার তথ্যাদি হাতে আসা মাত্রই শুরু হবে ডিলিমিটেশনের কাজ এবং কোন আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হবে তার রোটেশন হবে ডিলিমিটেশন এক্সারসাইজের উপর ভিত্তি করে।

বিরোধীদের দাবি ছিল মহিলা সংরক্ষণ লাগু করা হোক অবিলম্বে। সংরক্ষণের বিষয়টিকে পরবর্তী সেন্সাস কার্যক্রম ও তৎপরবর্তী ডিলিমিটেশন এক্সারসাইজ ভিত্তিক করে দেওয়ার ফলে সংরক্ষণ আইন লাগু

হওয়ায় বিলম্বের যে 'ঘর' তৈরি হয়েছে তা নিয়ে ইতিমধ্যেই শোনা গিয়েছে নানাপ্রকার বিরোধীবাক্য। কিন্তু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন প্রশাসনিকভাবে। সংরক্ষিত আসনের রোটেশন ডিলিমিটেশন ভিত্তিক হলে তার প্রায়োগিক ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতা প্রশ্নাতীত হবে এবং তা নিয়ে আদালত চত্বরে দাঁড়িয়ে শাসক-বিরোধী তথা জনস্বার্থমূলক রাজনৈতিক চাপান-উতোরের সুযোগ থাকবে না বলেই মহিলা সংরক্ষণ আইনের প্রয়োগ আগামী ডিলিমিটেশনের কাজটি সম্পন্ন হওয়ার পর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংসদ। এ বিষয়ে বলা প্রয়োজন যে ডিলিমিটেশনের কাজটি হয়ে থাকে ডিলিমিটেশন কমিশনের দ্বারা যার দায়িত্বে থাকেন সুপ্রিম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত জজ। এহেন কমিশনের কাজটি কোয়াসি জুডিশিয়াল হওয়ার কারণে কমিশনের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা সংসদেরও নেই, আবার সেই রিপোর্টের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার সুযোগ অন্য কারুরও নেই। অপরপক্ষে, ভারতবর্ষের রাজনীতির বর্তমান গতিপ্রকৃতি থেকে একথা বলাই যায় যে মহিলা সংরক্ষিত আসনের রোটেশন ডিলিমিটেশন-ভিত্তিক না হলে স্রেফ আসন সংরক্ষণ ঠেকানোর জন্যই বুঝি-বা বহু আসনের সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে আদালতে চলে যেতে পারে বহু রাজনৈতিক দল তথা ব্যক্তি। সংবিধানের নীরবতার সুযোগ নিয়ে, আইনের অস্পষ্টতার ফাঁক গলে, আইনের ধারার অপব্যাখ্যার মাধ্যমে এবং সুপ্রিম কোর্টের বেশ কয়েকজন জজসাহেবের 'পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিজম'-এর মনোভাবের সদ্ব্যবহার করে যে কোনো বিষয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়ে বিষয়টিকে পণ্ড করার প্রয়াস বর্তমান সময়ের রাজনৈতিক প্রয়াসগুলির অন্যতম বলেই মহিলা সংরক্ষিত আসনের রোটেশন ডিলিমিটেশন-ভিত্তিক করার সংশোধনীটি আবশ্যক ছিল বলে বোধ হয়।

বর্তমান পরিস্থিতিতে লোকসভা আসনের এক-তৃতীয়াংশ তথা নানা রাজ্যের বিধানসভা আসনগুলির এক তৃতীয়াংশ মহিলাদের জন্য randomly (অর্থাৎ দৈবচয়নের মাধ্যমে) সংরক্ষিত করে দিলে কোন্ আসন মহিলাদের দেওয়া যায় আর কোনটি দেওয়া যায় না তা নিয়ে কোন্দল যে শুরু হতোই তা একরকম বলাই যায়। তারপর এমন সব কোন্দল শান্ত হতো আদালতের দুয়ার থেকে স্থগিতাদেশ আসার পর, ফলত মামলার মুখে পড়া আসন যেমন ছিল রয়ে যেত তেমনই, মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হওয়া তার আর হতো না। এমন সমস্ত সম্ভাব্য সমস্যার কথা অনুমান করেই সংরক্ষিত আসনের রোটেশন ডিলিমিটেশন-ভিত্তিক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে বোধ হয়।

প্রতি জেলা, তহশিল ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সেন্সাস ডেটার ভিত্তিতে এই সব অঞ্চলের সীমারেখা নতুনভাবে চিহ্নিতকরণের কাজ করে থাকেন ডিলিমিটেশন কমিশনের সদস্যরা। সেই সূত্রে সেন্সাস ও ডিলিমিটেশন-সহ সম্পূর্ণ কাজটি শেষ হতে লাগার কথা বেশ কয়েক বছর। নিয়মানুযায়ী, সাধারণ মানুষের মতামতের জন্য ডিলিমিটেশন কমিশনের প্রাথমিক ড্রাফট রিপোর্টটি প্রথমে ছাপা হয় ভারত সরকারের গেজেটে যার পর সাধারণ মানুষের মতামত বিবেচনা করে সেই মতামতের প্রতিফলন-সহ প্রকাশিত হয় চূড়ান্ত রিপোর্ট। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন যে ২০২৪ এর লোকসভা ভোটের পরেই শুরু হবে সেন্সারের কাজ এবং শেষ করা হবে যথাশীঘ্র।

স্মরণাতীতকাল থেকে শক্তির প্রতীক হিসেবে মহিলারা ভারতবর্ষে পূজিতা, তাঁরা অবলা নন। কিন্তু এহেন আধ্যাত্মিক ও বাস্তব চেতনা বর্তমানে বিস্মৃত হয়েছে ভারতীয় সমাজ। ফলে নারীর দুর্গতি বৃদ্ধি পেয়েছে দিনে দিনে এবং দেশের কোণায় কোণায় মহিলাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত হচ্ছে নানা প্রকারের অপরাধ। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর সাম্প্রতিকতম রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে মহিলাদের প্রতি অপরাধের সংখ্যায় সর্বপ্রথম স্থানে রয়েছে বিবাহিত মহিলাদের প্রতি ঘটা পারিবারিক হিংসার ঘটনাগুলি। ২০২১ এর তুলনায় ২০২২ সালে দেশে মহিলাদের প্রতি অপরাধ বৃদ্ধি পেয়েছে ৪ শতাংশ এবং এই জাতীয় অপরাধের ৩১.৪ শতাংশই বিবাহিত মহিলাদের উপর স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির নির্যাতন সংক্রান্ত। এমন পরিসংখ্যানের নিরিখে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে পারিবারিক হিংসার এমন আবহে দেশ ও সমাজ গঠনে যথোচিত অংশগ্রহণ মহিলারা করবেন কীভাবে? কিন্তু এই জাতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য এবং নারী

ফঃ ৪

যে অবলা নয় সে চেতনার পুনর্জাগরণের জন্যও দেশের গণতান্ত্রিক নীতিনির্ধারণে নারীর উপস্থিতি ও অংশগ্রহণের নিশ্চিতকরণ আবশ্যক ছিল। 'সংসদে মহিলা প্রতিনিধিত্বের ৩০ শতাংশ **ক্রিটিক্যাল মাস** থাকলে মহিলা সশক্তিকরণের ক্ষেত্রে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বার কথা।' —বলেছেন রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতীয় মহিলাদের প্রতিনিধি সুজান ফার্গুসন। 'লিঙ্গসাম্য যে কেবলমাত্র কাঙ্ক্ষিত এক বিষয় হিসেবে চিরকাল অধরাই থেকে যাবে এমন নয়, বরং ভারতের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বুঝিয়ে দিচ্ছে যে তার প্রতিষ্ঠাও সম্ভব।' বলেন সুজান।

মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ করানোর উদ্যোগ ইতিপূর্বেও ভারতের সংসদ নিয়েছে বহুবার। কিন্তু সে সমস্ত উদ্যোগ সাফল্যের মুখ দেখে উঠতে পারেনি। উদাহরণস্বরূপ, 'দ্য কনভেনশন অন দ্য এলিমিনেশন অব অল ফর্মস অফ ডিসক্রিমিনেশন এগেইনস্ট উইমেন, ১৯৭৯'-এর অন্যতম সিগনেটরি ভারত হওয়া সত্ত্বেও দেশের বিভিন্ন নীতি নির্ধারণী পরিসরে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব দেশের প্রথম লোকসভায় ৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে সপ্তদশ লোকসভায় হয় মাত্র ১৫ শতাংশ। এর কারণ হলো—মহিলা সংরক্ষণ বিল সংসদের দুই কক্ষে পাশ করে দেখানোর ক্ষমতা ইতিপূর্বে দেখাতে পারেনি কোনো লেজিসলেচারই। গণতান্ত্রিক পরিসরে কিছুটা স্থান মহিলাদের জন্য ছাড়তে ভারতের পুরুষ সাংসদদের এক বড়ো অংশ রাজি ছিলেন না। কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সংসদে দু' একজন ছাড়া সকল সাংসদই সমর্থন করেছেন এই বিল।

তথ্যগতভাবে দেখলে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে দেশের সংসদে ও বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের উদ্যোগ ইতিপূর্বে নেওয়া হয়েছে আরও বার সাতেক। যথাক্রমে ১৯৮৯, ১৯৯৬, ১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০২, ২০০৩ এবং ২০০৮ সালে, যার মধ্যে প্রথমবার বিলটি লোকসভায় পাশ হলেও রাজ্যসভার সমর্থন পায়নি এবং পরের পাঁচ বার সমর্থন পায়নি লোকসভাতেই। ২০০৮ এর বিলটি রাজ্যসভায় পাশ হয় কিন্তু তারপর লোকসভায় উপস্থাপিত হয় না এবং সেই অবস্থাতেই শেষ হয় পঞ্চদশ লোকসভার মেয়াদ। তারপর ২০২৩ সালে সংসদের দুই কক্ষেই বিপুল সমর্থন নিয়ে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ করিয়ে নরেন্দ্র মোদী প্রমাণ করলেন যে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে উইমেন এমপাওয়ারমেন্টের পুরোধা পুরুষ তিনিই।

নেহরুর শাসনকাল শেষ হয়ে মহিলা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকাল শুরু হওয়ার পর ভারতে মহিলাদের অবস্থা কী প্রকার ছিল আন্দাজ পাওয়া যায় তারও। ১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘ নির্ধারিত আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ পালনের পূর্বে ভারতের সাংবিধানিক, প্রশাসনিক ও আইনি প্রভিশনগুলির প্রভাব মহিলাদের সামাজিক, শৈক্ষিক ও কর্মক্ষেত্রগত পরিস্থিতি কী প্রকার তা খতিয়ে দেখতে তৎকালীন শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ দপ্তর থেকে ১৯৭১ সালে গঠিত হয়েছিল একটি কমিটি (CSWI), যে কমিটি পেশ করেছিল 'টুওয়ার্ডস ইক্যুয়ালিটি' নামক একখানি রিপোর্ট যাতে লেখা ছিল যে লিঙ্গসাম্য প্রতিষ্ঠার সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ভারত সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এহেন রিপোর্টের পরেই মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষিত হতে শুরু করে দেশের নানা রাজ্যের লোকাল বডিগুলিতে।

তার ১৬ বছর পর, ১৯৮৭ সালে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মার্গারেট আলভা-র নেতৃত্বে গঠিত হয় ১৪ সদস্যের একটি কমিটি। ১৯৮৮ সালে সেই কমিটি প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর কাছে জমা দেয় 'ন্যাশনাল পার্স্পেক্টিভ প্ল্যান ফর উইমেন ১৯৮৮-২০০০' যার মধ্যে ছিল মোট ৩৫৩টি সুপারিশ যার অন্যতম ছিল 'মহিলা সংরক্ষণ আইন' প্রণয়নের বিষয়টি। এর পরেই ১৯৮৯ সালের মে মাসে লোকসভায় রাজীব গান্ধী পাশ করান মহিলা সংরক্ষণ বিল যেটি সেপ্টেম্বর মাসে পরাস্ত হয় রাজ্যসভায়। তবে এ বিষয়ে অবশ্য উল্লেখ্য—যে সময়ে মার্গারেট আলভার নেতৃত্বে মহিলাদের জন্য নীতি প্রণয়ন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন রাজীব গান্ধী, সেই একই সময়ে সেই রাজীব গান্ধীই শাহবানু মামলায় সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়কে নস্যাৎ করে কট্টরপন্থী মুসলমানদের চরম নারীবিদ্বেষী মতকে সমর্থন করে নিয়ে এসেছিলেন Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act. মুসলমানদের এককাট্টা ব্লক ভোটের মোহে। তার ফলশ্রুতি হিসেবেই বুঝি-বা সংসদ ও বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের বিষয়টির রূপায়ণ ততদিন পর্যন্ত হয়নি যতদিন না নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সংসদ সুপ্রিম কোর্ট প্রদত্ত 'ট্রিপল্ টেস্ট' নীতি মান্য করে সংসদে তা রূপায়ণযোগ্যভাবে পেশ করতে পারল ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। নারী প্রগতি ও মূলগতভাবে লিঙ্গসাম্য বিরোধী ইসলামীয় পদ্ধতি যে হাত ধরাধরি করে চলতে পারে না রাজীব গান্ধী সরকারের দ্বিচারিতা ও ভারতীয় মহিলাদের তজ্জনিত পশ্চাদপসরতা তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তবে সুখের কথা যে,—নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন ভারতের সংসদ কেবলমাত্র মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ করেই ক্ষান্ত হয়নি। মহিলা সুরক্ষার কথা চিন্তা করে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে পাশ হওয়া নতুন দণ্ডবিধি 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা'য় নারীসুরক্ষা সংক্রান্ত আইনগুলির দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন করেছে তাৎপর্যপূর্ণভাবে। মহিলাদের প্রতি কৃত নানাপ্রকার অপরাধের প্রবণতা কমাতে এবং মহিলাদের পক্ষে সেই সব অপরাধ বিরোধী আইনগুলির ব্যবহারকে সহজতর করতে নতুন আইনে আনা হয়েছে নানা পরিবর্তন। যেমন, 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা'র ৬৯ নম্বর ধারায় (এবং আরও অন্য ধারাতেও) ছলচাতুরির মাধ্যমে প্রেম ও সহবাসের মতো কর্মের জন্য নির্মিত হয়েছে গুরুতর শাস্তির বিধান যার দ্বারা 'লাভ জিহাদ' এর মতো অপরাধগুলির হার হ্রাস পাবে বলেই আশা করা যায়।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন যে, আত্মগত মাতৃশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হওয়াই নারীর ক্ষমতায়নের একমাত্র পথ। এই সন্ধিক্ষণ স্বামীজীর বাণী স্মরণ করার—"হে ভারত, ভুলিও না, তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী"। স্মরণ করতে হবে যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের পথ, আশীর্বাদ করে মেয়েদের হাতে যিনি দিয়েছিলেন ত্রিশূল। মাতৃশক্তির মহাজাগরণই উইমেন এমপাওয়ারমেন্টের একমাত্র পথ এবং নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন ভারতবর্ষ সেই পথেরই দিক নির্দেশ করবে বলে ভরসা করার কারণ আছে। ■

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES • SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি এবং ন্যাশনাল লজিসটিক্স পলিসি দেশের ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রকে আন্তর্জাতিক মানে নিয়ে যাবে

সুদীপ্ত গুহ

স্বাধীনতার আগে ব্রিটিশরা রেল, রাস্তা ইত্যাদি পরিকাঠামো বানিয়েছিল, মূলত তাঁদের তৈরি পণ্য পরিবহণের জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু। তাই কিছু অঞ্চল বাদে বাকি দেশ ছিল গরিব। স্বাধীনতার পর একদিকে যখন দারিদ্র্য দূরীকরণকে প্রধান লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করা হলো, তখন করা হলো ঠিক উলটো কাজগুলোই। পরিকাঠামো তৈরি করে দেশের মানুষকে আত্মনির্ভর না করে, শুরু হলো জাতীয়করণের মতো সস্তা জনপ্রিয়তার পালা। অর্থাৎ, করের টাকায় রাস্তাঘাট, জলপথ উন্নয়ন, বন্দর না বানিয়ে, বেসরকারি কোম্পানি কিনে নেওয়ার খেলা। স্বাধীনতার পর প্রথম দশ বছর ব্রিটিশদের থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষতিপূরণ এবং সেই সময় ব্রিটেনে আমদানির করা খাদ্যের দাম (যা ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের কারণ) দিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার ভারত সরকারকে এবং সেই টাকায় কেনা শুরু হলো ব্রিটিশ কোম্পানিগুলিকেই। সঙ্গে তৈরি হওয়া শুরু হলো স্টিল প্ল্যান্ট থেকে পাওয়ার প্লান্ট। কিন্তু এক্ষেত্রেও অধিকাংশ যন্ত্র আনা হলো রাশিয়া থেকেই। জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুর সময় ভাঁড়ার প্রায় যখন শূন্য অবস্থা, তখন এলেন লালবাহাদুর শাস্ত্রী। কিন্তু তিনি কিছু বুঝে উঠতেই, ঘটলো তার অস্বাভাবিক মৃত্যু। ইন্দিরা গান্ধী আরও কট্টর জাতীয়করণ শুরু করলেন। ব্যাংক থেকে ইস্কো জাতীয়করণে সরকারি বরাদ্দ বাড়লো। বন্ধ হলো সড়ক, বন্দর, বিমানবন্দর, জলপথ, রেল, পানীয় জল, সেচ এবং পরিবেশ পরিকাঠামো নির্মাণ। বাড়লো বেকারত্ব, বাড়লো মুদ্রাস্ফীতি এবং কমলো দেশের বৃদ্ধির হার। ওদিকে দুটো পরমাণু বোমার ধাক্কা সামলে জাপান তখন আবার ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। ১৯৭৮-এ চীনও মুক্ত বাজার অর্থব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিন্তু ১৯৮০-তে ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় এসে কোনো সংস্কার তো শুরু করলেনই না, উলটে দানখয়রাতি শুরু করলেন। যার নাম দিলেন গরিবি হটাও প্রকল্প। ১৯৯১-তে দেশ যখন দেউলিয়া হবার মুখে, নরসিমা রাও আনলেন মুক্তবাজার অর্থনীতি। কিন্তু উপেক্ষিত রয়ে গেল কৃষি এবং উৎপাদন শিল্প। তাড়াতাড়ি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কম সময়ে উনি জোর দিলেন সফটওয়্যার ইত্যাদি পরিষেবা ক্ষেত্রে। যদিও তার লাভ দেশ সেই সময় ওঠায়।

১৯৯৮-তে অটলবিহারী ক্ষমতায় এসে প্রথমবার জোর দিলেন সড়ক, জলপথ, বন্দর, মেট্রো রেল নির্মাণে। ঘোষণা করলেন সুবর্ণ চতুর্ভুজ প্রকল্প, রিভার লিংকিং অর্থাৎ নদী সংযুক্তি। দিল্লি-সহ বিভিন্ন শহরে মেট্রো রেল কর্পোরেশন তৈরি করলেন। কিন্তু ২০০৪-এ হেরে যাওয়ার পর, পরিকল্পনায় ভাটা পড়লো আবার। রাজনৈতিক সদিচ্ছার কারণে পরিকাঠামো নির্মাণ শুরু হলেও তৎকালীন জলসম্পদ মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী বন্ধ করে দিলেন নদী সংযুক্তি প্রকল্প। কমলনাথ মধ্যপ্রদেশে নিজের কেন্দ্রে সড়ক তৈরির উপর জোর দিলেন এবং তার উত্তরসূরীরাও একই রাস্তা নিলেন। ২০০৯ সালে মমতা ব্যানার্জী ঘোষণা করলেন সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে রেল যাবে। সংসদে বিরোধীরা ঝড় তোলেন যে সিঙ্গুরের মানুষের নন্দীগ্রাম যাওয়ার কী প্রয়োজন। এরপরে শুরু হয় দুর্নীতির যুগ। একের পর এক স্ক্যামে বন্ধ হয়ে যায় দেশের উন্নতি। ২০১৪-এ ক্ষমতায় এলেন নরেন্দ্র মোদী।

নরেন্দ্র মোদী লক্ষ্য করলেন, চীন থেকে অধিকাংশ জিনিস আমাদের আমদানি করতে

হয়। তাছাড়া ভোজ্য তেল, কয়লা, জ্বালানি, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম থেকে টিভি, মোবাইল সবকিছু বাইরে থেকে আসে। ক্ষমতায় এসে কর ব্যবস্থা, ব্যাংকিং থেকে বহু কর্পোরেট আইনে পরিবর্তন আনেন। কিন্তু দেখলেন ভারতের শ্রমিক সস্তা, সস্তা জমি, কর ছাড়, বিদ্যুৎ শুল্ক ছাড় ইত্যাদি দেওয়া হলেও বিনিয়োগে এগিয়ে মেক্সিকো, থাইল্যান্ড, তাইওয়ান, ভিয়েতনাম, এমনকী কিছুক্ষেত্রে বাংলাদেশ। কিন্তু বেকারত্ব দূর করতে হলে প্রয়োজন ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প। বাধা পরিকাঠামো। বন্দর পৌঁছনোর সময়, খরচ, লাল ফিতে এবং বন্দরে পণ্য তোলার সময় ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই পিছিয়ে ভারত। তৈরি হলো পরিকল্পনা। ঘোষণা করলেন ১১১ লক্ষ কোটির গতিশক্তি মাস্টারপ্ল্যান। কারণ পরিবহণ খরচ বেশি এবং সিস্টেমে পরিকল্পনা ও প্রযুক্তির অভাব। কিছু উদাহরণ নেওয়া যাক—

১। বিনিয়োগকারী দেখে বন্দর কত দূরে এবং কীভাবে যাবে? পানাগড়, রঘুনাথপুর ও খড়্গপুরে আজ থেকে দুই দশক আগে জমি চিহ্নিত করার পরেও কেন আসেনি বিনিয়োগ? কারণ হলদিয়া বন্দরে যাওয়ার রাস্তা উপযোগী নয়। রেল সংযোগ নেই। বিমানবন্দর নেই।

২। বন্দরগুলি দক্ষ নয়। পণ্য নামিয়ে ফিরে যেতে প্রচুর সময় লাগে। ভারতে এই সময় চীনের প্রায় পাঁচ গুণ। ফলে জাহাজের ভাড়া বেশি লাগে। খরচ বাড়ে আমদানি ও রপ্তানিকারীর। ভারতের পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে দামের প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে। প্রতিবছর দেশের ১৮০ বিলিয়নের বেশি খরচ হয় শুধু বন্দর অদক্ষ বলে।

৩। বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের অভাব। ধরা যাক, এই বছর রাস্তা বানানো হলো। ছয় মাস পর টেলিকম মন্ত্রক রাস্তা খোঁড়া শুরু করলো কেবল পাততে। তাঁদের কাজ শেষ হতেই গেইল এল গ্যাসপাইপ বসাতে। ফলে বছরের পর বছর ওই রাস্তায় যোগাযোগ ব্যাহত হচ্ছে। বাড়ছে পরিবেশ দূষণ।

৪। ধরা যাক, রেলের উপর ব্রিজ বানানো হবে বা রেল লাইনের নীচ থেকে জলের পাইপ যাবে। বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হতো। এছাড়া আছে জমি জট। কলকাতার বিভিন্ন মেট্রো রেল, বিদ্যাসাগর সেতু, বেলঘড়িয়া ওভারব্রিজ, মা ফ্লাইওভার এই সমস্যার কিছু উদাহরণ।

এ সমস্যা সমাধানে মোদী একটা নতুন জিআইএস প্লাটফর্ম বানালেন যেখনে সড়ক, বিমান, খনি, মৎস্য, বন্দর, রেল, MSME, কাস্টমস, ভূমি এবং বিভিন্ন শুল্কদপ্তর এক পোর্টালে থাকবে। তথ্য বিনিয়োগ এবং সহযোগিতা বাড়বে। আজও আমাদের রাজ্যের JNNURM এবং NGRBA-র বিভিন্ন জল ও নিকাশি প্রকল্প আটকে রয়েছে এই তথ্যের অভাবের জন্য। প্ল্যানিং, পরিবেশ, ভূমি ইত্যাদি অনুমোদন ও ছাড়পত্র পাওয়া অনেক সহজ হবে। এছাড়া বিনিয়োগকারী বা রপ্তানি কোম্পানি জানতে পারবে কিভাবে সে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাবে। ধরা যাক দেউচার কয়লা যেতে হবে হলদিয়া, বান্ডেল, সাঁওতালডি ও কোলাঘাট। দেউচা প্রকল্পের সঙ্গে আর কোন পরিকাঠামো বানালে সেই কয়লা বাজারের অন্য প্রতিযোগীর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে দামে? কীভাবে ভারতমালা, সাগরমালা, IWAI এবং UDAN ইত্যাদির সঙ্গে জুড়ে সঠিক বাজার পাবে দেউচা?

এখানে প্রস্তাব আসছে ULIP ইউনিফায়েড বা লজিসটিক্স ইন্টারফেস প্ল্যাটফর্ম'-এর। যেখানে makemytrip বা UBER-এর মতো পরিবহণ সংস্থার দেখানো পদ্ধতি অনুসরণে জানা সম্ভব হবে যে বিমান, রেল, সড়ক না জল কোন পথে এবং কোন বন্দরে কম সময়ে ও কম খরচে যাওয়া সম্ভব হবে। কোথায় পাওয়া যাবে সে মধ্যবর্তী ওয়্যারহাউস বা গুদাম। এই ব্যাপারটা আরও বেশি আনা হয়েছে ন্যাশনাল লজিসটিক্স পলিসিতে। এখানে কিছু তথ্য নিয়ে আলোচনা করা যাক কীভাবে এই ULIP নামক কম্পিউটার প্রোগ্রাম বানানো হয়েছে।

আমাদের দেশে মেট্রিক টন প্রতি কিলোমিটার প্রতিদিন পরিবহণে বিমানে খরচ ১৮ টাকা, সড়কে ৩.৬ টাকা, জলে ২ টাকা, পাইপলাইনে ২ টাকা এবং রেলে ১.৬ টাকা। কিন্তু ৭১% পরিবহণ হয় সড়ক পথে, ১৮% রেলে। জলপথে নগণ্য। এখানে সরকার চাইছে একটা optimisation, অর্থাৎ সঠিক বিকল্প। কিভাবে জলপথ, রেলপথ, সড়ক, বিমান ইত্যাদির মাধ্যমে সঠিক সময়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো যায়, কম সময়ে। গাড়ি যাতে খালি ফিরে না আসে। কম্পিউটারভিত্তিক একটা মাল্টিমোডাল লজিসটিক্স হাব।

এই প্রকল্পের অধীনে আছে বিভিন্ন ৩৫টি মাল্টিমোডাল লজিসটিক্স হাব, যার সঙ্গে যুক্ত হবে দেশের দেড় লক্ষ কিলোমিটার জাতীয় সড়ক, দুই লক্ষ কিলোমিটার রাজ্য সড়ক, সাগরমালা (৬ লক্ষ কোটি টাকার বন্দর প্রকল্প), ১১১ জাতীয় জলপথ, দেড়শো বিমানবন্দর এবং ৮৩৫৯ কিলোমিটার ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোর। প্রতিটি অপারেশন এমনভাবে কম্পিউটার দিয়ে যুক্ত হবে যে makemytrip এর মতো কম সময়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছাবে। বিভিন্ন ছাড়পত্রও পাওয়া যাবে অনলাইনে। ফলে রাস্তায় অসৎ ট্রাফিক পুলিশের অত্যাচার থেকে পাওয়া যাবে চিরকালের জন্য মুক্তি। এই প্রকল্পের লজিসটিক্স বাবদ যে টাকা বাঁচবে তার পরিমাণ দেশের জিডিপির ২%। ফলে কমবে তেল আমদানির খরচ। বাঁচবে বিদেশি মুদ্রা। প্রকল্প তাড়াতাড়ি শেষ হওয়ায় বাড়বে জিডিপি বৃদ্ধির হার এবং আসবে বিদেশি পুঁজি। কৃষি এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে বাড়বে মানুষের আয়। কমবে অপচয়।

২০৪৭ এর মধ্যে পৃথিবীর প্রথম অর্থশক্তি হওয়ার পথে অন্যতম হাতিয়ার এই National Logistics policy এবং গতিশক্তি প্রকল্প। ■

দেশপ্রেমের মূর্ত প্রতীক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

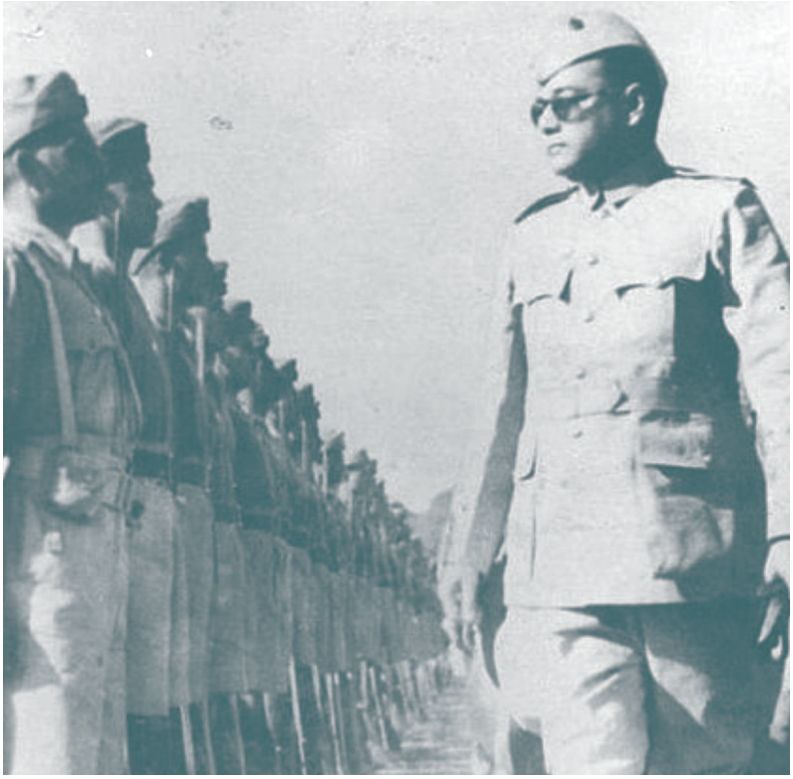

ড. তন্ময় দাস

'নেতাজী' এই নামটাই আমাদের কাছে প্রেরণা। 'নেতাজী' ও 'দেশপ্রেম' শব্দ দুটি সমার্থক। নেতাজী সুভাষ— শুধুই কি একটি আবেগপূর্ণ চরিত্র? ত্যাগ, তিতিক্ষা, আবেগ সবকিছুর তীব্র অনুভূতিপ্রবণ এক পুরুষকার চরিত্র ছিলেন নেতাজী সুভাষ। কিছুটা আবেগ প্রকাশিত হয় বাল্যকালে ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসির দিনটিকে শহিদ দিবস হিসেবে পালনের মাধ্যমে আর প্রেসিডেন্সি কলেজে ওটেন সাহেবের ভারত বিদ্বেষী মনোভাবের প্রতিবাদ করার মধ্যে দিয়ে।

কেমব্রিজ থেকে ফেরার পর গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি তাঁকে পশ্চিমবঙ্গে চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে দেখা করতে বললেন। দেশবন্ধু তাঁকে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর দায়িত্ব দিলেন। দেশবন্ধুর স্ত্রী বাসন্তী দেবীকে মাতৃজ্ঞানে ভক্তি করতেন। মা প্রভাবতী দেবী বলতেন বাসন্তীদেবীকে, 'সুভাষ অর্ধেক আমার ছেলে বাকি অর্ধেক আপনার।'

১৯২৮ সালে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের সভায় সুভাষ সামরিক বেশে উপস্থিত হলেন। গান্ধীজী এই মনোরম দৃশ্যকে 'তামাশা' (Circus of Park Circus) বলে অভিহিত করলেন। ভিয়েনায় থাকাকালীন 'দি ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল্' বইটি প্রকাশ করেন। ইংরেজ সরকার এই বই ভারতে আসা নিষিদ্ধ করল। তাদের ধারণা ভারতে এই বইটি এলে বিপ্লবী যুবকরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে আরও উদ্বুদ্ধ হবে। বইটি সম্বন্ধে রোমাঁ রোলাঁ ও আইরিশ বিপ্লবী ডি ভ্যালেরা উচ্চ প্রশংসা করেন। হরিপুরা কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হলেন। পরের অধিবেশন ত্রিপুরীতেও তিনি গান্ধী মনোনীত পট্টভি সীতারামাইয়াকে পরাজিত করলেন। গান্ধীজী বললেন সীতারামাইয়ার পরাজয় তাঁর নিজের পরাজয়। গান্ধীজী সুভাষকে বখাটে ছেলে (Spoilt Child) বলে অভিহিত করেন। কিন্তু জাতির জনক উপাধিটি সুভাষের দেওয়া। সুভাষচন্দ্রের প্রতি কংগ্রেস-নেতৃত্বের এই ব্যবহারে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ খুব ব্যথিত হলেন। তিনি গান্ধীজীকে লিখলেন দেশের কথা ভেবে সুভাষকে কংগ্রেসে ফিরিয়ে নিতে। কিন্তু গান্ধীজী কবিগুরুর আবেদনেও সাড়া দেননি। প্রথমবার কংগ্রেসের সভাপতি হয়ে শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর সঙ্গে দেখা করতে গেছিলেন। তিনি 'তাসের দেশ' নাটিকাটি সুভাষচন্দ্রের নামে উৎসর্গ করেন।

এরপর সুভাষচন্দ্র 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠন করলেন। সুভাষচন্দ্রের কৃতিত্বে যে মহাজাতি সদন নির্মিত হয় তার নামকরণ করেন রবীন্দ্রনাথ।

এই সময়ে দশ মাসের মধ্যে কয়েক হাজার জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই পর্যায়ে মাদ্রাজের সমুদ্র সৈকতে কয়েক লক্ষ মানুষের সর্ববৃহৎ সভায় আসন্ন যুদ্ধের সম্ভাবনা ও সুযোগের কথা বলার সময় জনৈক শ্রোতা সুভাষের হাতে একটি চিরকুট পৌঁছে দেন— যাতে লেখা ছিল সদ্যপ্রাপ্ত সংবাদ— এদিনই জার্মানি ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনার ঘোষণা ছিল তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতারই পরিচয়।

তাঁর জাপান গমনের ব্যাপারে হিটলার পরামর্শ দেন তাঁকে, ব্রিটিশ বাহিনী তাঁকে আক্রমণ করতে পারে এই কারণে

আকাশপথে প্রেরণের বদলে একটি সাবমেরিনের ব্যবস্থা করে দেন যা তাঁকে জাপান অধিকৃত সাবাং পৌঁছে দেবে।

'স্বাধীনতা প্রদত্ত হয় না এটি কেড়ে নিতে হয়'। হিটলার বলতেন আমি সমগ্র জার্মানির নেতা আর সুভাষ কোটি কোটি ভারতীয়ের নেতৃস্থানীয়। নেতাজীকে জার্মানরাই প্রথম 'নেতাজী' অর্থাৎ নেতাদের নেতা (ফ্যুয়েরার) সম্বোধন করেন।

জাপানের উদ্দেশে রওনায় একমাত্র সঙ্গী ছিলেন আবিদ হাসান। এই পর্যায়ে তাঁকে একটি সাবমেরিনে জার্মানি থেকে অন্য একটি সাবমেরিনে জাপানে স্থানান্তরিত করতে হয় একটি রবারের ভেলার মাধ্যমে যা ছিল একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক, কারণ যেখানে আকাশ ও নৌবাহিনীর কেন্দ্র স্থলে ব্রিটিশ ছিল।

জাপানে পৌঁছে সুভাষ জাপানি প্রধানমন্ত্রী তোজোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ওখানে রাসবিহারী বসু এক মিটিঙে নেতাজীর হাতে আইএনএ-এর ভার সঁপে দিলেন। এর পরের দিন নেতাজী আইএনএ-এর নতুন নামকরণ করলেন 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'। তিনি সৈন্য দলকে উদ্দেশ্য করে বললেন তোমাদের রণধ্বনি হবে 'চলো দিল্লি'। 'চলো দিল্লি' ধ্বনি-সহ সুভাষ যেখানেই বক্তৃতা দিতেন তাঁর অনবদ্য বাচনভঙ্গীতে দর্শককুল বাকরহিত হয়ে যেত এবং তাঁরা তাঁদের সমস্ত সঞ্চয় অকাতরে দান করে দিত। শিল্পপতি, বাণিজ্য সংস্থা, ব্যবসায়ী এবং নারী-পুরুষ সবাই এগিয়ে এসে তাদের সম্পদ ও স্বর্ণালংকার অকাতরে দান করত।

মহিলাদের প্রতি তাঁর আবেদন শুধুমাত্র নারী-সুলভ ছিল না। আবিদ হাসানের সঙ্গে যাত্রাকালে তিনি ভারতীয় মহিলাদের আইএনএ-তে যোগ দেওয়ার কথা বলেন এবং এর সঙ্গে কীভাবে তাদের অতি প্রিয় শাড়ি পরিত্যাগ করে রণসাজ পরতে হবে সেই প্রসঙ্গও তোলেন। বর্তমান ভারতের প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলই কমিউনিস্ট, সমাজবাদী, কী গান্ধীবাদী সবার উৎপত্তিই কংগ্রেস থেকে। একমাত্র দক্ষিণপন্থী হিন্দু জনসঙ্ঘেরই ভিন্ন উৎপত্তি।

নেহরুর সবচেয়ে বেশি রাগ ছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আর তার আজাদ-হিন্দ বাহিনীর উপর। নেহরু লাহোরের এক বক্তৃতায় বললেন, সুভাষ যদি জাপানিদের সাহায্যে সৈন্যদল নিয়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে আসে তিনি একা তরবারি হাতে বাধা দিতে এগিয়ে যাবেন।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় শ্যামাপ্রসাদ পশ্চিমবঙ্গের মানুষের পাশে এসে দাঁড়ালেন। নেতাজী ঘোষণা করলেন তিনি বঙ্গপ্রদেশের জন্য যত চাল লাগুক ব্যবস্থা করবেন বার্মা থেকে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এই ব্যাপারে পূর্ণ অসহযোগিতা করল এবং নিষ্ঠুরচিত্তে ভারতীয়দের মৃত্যু ঘটালো।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, শ্রীঅরবিন্দ ও ভগবদ্‌গীতার ঈশ্বরীয় প্রভাবে। তাঁর সামরিক পোশাকে বা বুকপকেটেও একটি 'গীতা' সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল।

আইএনএ-এর মহিলা বাহিনীর নাম রানি ঝাঁসি বাহিনী— যার প্রধান ছিলেন লক্ষ্মী সায়গল। সারা এশিয়ায় এই বাহিনী প্রথম মহিলা সৈন্যবাহিনী। আইএনএ-এর উদ্দেশ্যে একটি উদাত্ত ভাষণে ভারতীয়দের জনসমাগমে নেতাজীর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ উক্তিটি ছিল 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।' আজাদ হিন্দ সরকারের নিজস্ব মুদ্রা, ডাক টিকিট, আদালত ছিল। বিশ্বের ১১টিও বেশি দেশ যেমন জার্মানি, জাপান, রাশিয়া, ইতালি প্রভৃতির স্বীকৃতি লাভ করে।

১৯৪৪ সালের ১৪ এপ্রিল ভারতীয় তেরঙ্গা পতাকা ভারতীয় ভূখণ্ডে উত্তর-পূর্ব ভারতে অবস্থিত মণিপুরের মৈরাঙে প্রথমবারের জন্য উত্তোলন করা হয়।

১৯৪৫-এর এপ্রিল নাগাদ জাপানি ও আইএনএ সৈন্য ক্ষমতা ৪০ শতাংশে নেমে এল। এর সঙ্গে সর্বশেষ সর্বনাশটি সংঘটিত হলো আকস্মিক বর্ষার আগমনে। বর্ষার প্রাদুর্ভাবে রাস্তা কর্দমাক্ত ও বিভিন্ন রোগ যেমন কলেরা, ডিসেন্ট্রি, বেরিবেরি সবশেষে ৮ জুলাই সৈন্যদের পরামর্শে তোজো অভিযান বন্ধ রাখার নির্দেশ দিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুক্ত সমাপ্তির দিকে এগিয়ে গেল। জার্মানি ও ইতালি আত্মসমর্পণ করেছে--- জাপান তখনো করেনি। আমেরিকা জাপানকে শায়েস্তা করার জন্য হিরোশিমায় ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট এবং ৯ আগস্ট নাগাসাকিতে 'লিটল্ বয়' ও ফ্যাট-ম্যান ২টি পরমাণু বোমা ফেলে। তিন লক্ষ লোক মারা যায় এবং বিষাক্ত তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে আরও তিন লক্ষ মানুষ মৃত্যু পথযাত্রী হয়। অক্ষশক্তির আত্মসমর্পণ, ঘোর বর্ষা ইত্যাদি কারণে নেতাজীকে সেই সময় আত্মগোপন করতে হয়। তা সত্ত্বেও একথা বলতেই হয়, নেতাজীর পরাক্রমের কারণেই ব্রিটিশকে তড়িঘড়ি ভারত থেকে পাততাড়ি গোটাতে হয়েছিল। দেশ দ্বিখণ্ডিত হলেও স্বাধীনতা এসেছিল। □

With Best Compliments from -

A Well Wisher

ইসলামি যুগে দিল্লি সম্রাট হিন্দুবীর হিমু

অমলেশ মিশ্র

ভাগ্য বা ঐতিহাসিক কেউই এই হিন্দু বীরের সঙ্গে ছিল না। তাই তিনি অবহেলিতই থেকে গেলেন। রাজস্থান রাজ্যের দক্ষিণে আলোয়ার। তারই কোনো শহরে একটি হতদরিদ্র দোকানি পরিবারে জন্ম। ভাগ্যক্রমে নজরে পড়ে যান ইসলাম শাহর, তার যোগ্যতার পরিচয় পেয়ে তাকে দিল্লি বাজারের সুপারিনটেনডেন্ট (শাহানা) করেছিলেন। এবং পরে গুপ্তচর বিভাগের প্রধান ও ডাক বিভাগের প্রধানের (দারোগা-ই ডাক চৌকি) পদে বসালেন। কালক্রমে তিনি ইসলাম শাহ সুরির খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন এবং যুদ্ধাদি সংক্রান্ত একান্ত গোপনীয় বিষয়েও পরামর্শ দেওয়ার অধিকারী হয়ে পড়েন। ক্রমে ক্রমে তিনি এক হিন্দু শাসকে উপনীত হন।

সামান্য একজন ফেরিওয়ালা বা দোকানদার থেকে হেমচন্দ্র হয়েছিলেন দিল্লির সম্রাট সম্পূর্ণ নিজের কৃতিত্বে। হেমচন্দ্র দিল্লির সিংহাসনে বসার পর নাম হয়েছিল হিমুশাহ। পরে 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করে হন রাজা হেমচন্দ্র বিক্রমাদিত্য। তিনি মোট ২২টি যুদ্ধ করেছিলেন এবং কখনও পরাজয় স্বীকার করেননি।

শের শাহের পুত্র ইসলাম শাহর মৃত্যুর পর (১৫৫৪) তাঁর নাবালক পুত্র সিংহাসন পেলেন। নাম ফিরোজ শাহ। কিন্তু তারই এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় শেরশাহর ছোটো ভাই নিজামের ছেলে মুবারিজ খান এই নাবালককে হত্যা করে সিংহাসন দখল করলেন। নাম নিয়েছিলেন আদিল শাহ (কেউ কেউ বলেন আদলি শাহ)। আদিল শাহ রাজন্যবর্গ, সেনাপতি ও সৈন্যদের অনেক উপহারাদি দিয়েছিলেন। কিন্তু সকলেই ফিরোজকে হত্যা করে সিংহাসন লাভের এই প্রচেষ্টাকে মন থেকে মেনে নিতে পারলেন না। ফলে তাদের মনে অসন্তোষ থাকল। মনে হলো এই ঘটনা যেন সুরি বংশের শেষ ডেকে আনল।

আদিল শাহ খুব কিছু উচ্চমানের মানুষ ছিলেন না। রাজ্য পরিচালনা করার যোগ্যতা ছিল না। ফলে চারিদিকে যে অসন্তোষ তৈরি হচ্ছিল তা সামাল দেওয়ার ক্ষমতা তার ছিল না। এই পরিস্থিতিতে ইসলাম শাহ একান্ত বিশ্বাসভাজন হিমুকে প্রধানমন্ত্রীর পদে বসালেন। হিমু নিজের গুণ ও দক্ষতায় দিল্লি বাজারের সুপারিনটেনডেন্ট ও দারোগা-ই-ডাকচৌকির পদে উন্নীত হন। তারও পরে সৈন্য বিভাগে উচ্চতর পদে নিযুক্ত হন।

এদিকে আদিল শাহর অপদার্থতায় চারিদিকে বিদ্রোহ দেখা দিল। আদিল শাহর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আগ্রার শাসক ইব্রাহিম খান সুরি বিদ্রোহ করলেন। আদিল শাহ প্রেরিত সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করে দিল্লির দিকে অগ্রসর হলেন। দিল্লি দখল করলেন। আদিল শাহর আর এক আত্মীয় লাহোরের শাসক আহমেদ খান সুরি— সিকান্দার শাহ নাম নিলেন এবং লাহোরকে স্বাধীন ঘোষণা করলেন। বাঙ্গলার শাসক মহম্মদ খান সুরি স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন এবং নাম নিলেন— সামসুদ্দিন মহম্মদ শাহ গাজি।

এইভাবে বহু যত্নে, পরিশ্রমে ও দক্ষতায় শেরশাহ যে সাম্রাজ্য তৈরি করেছিলেন— তা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। শেরশাহের পরেও ইসলাম শাহ, এই সাম্রাজ্য নিজ দক্ষতায় অটুট রেখেছিলেন। এখন সেই সাম্রাজ্য চার ভাগে ভাগ হয়ে গেল— দিল্লি, আগ্রা, পঞ্জাব, বাঙ্গলা। পঞ্জাবের সিকান্দার দিল্লি আগ্রার শাসককে পরাজিত করে দিল্লি ও আগ্রার দখল নিলেন (১৫৫৫)।

এই সমস্ত বিভাজন ও পারস্পরিক বিরোধিতার সুযোগ নিতে চাইলেন পারস্যে পলাতক হুমায়ুন। ১৫৫৪ সালের নভেম্বর তিনি কাবুল থেকে যাত্রা করে অগ্রসর হতে লাগলেন। রোহতাস দুর্গের রক্ষক তাতার খান হুমায়ুনের খবর পেয়ে দুর্গ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। ১৫৫৫-র ফেব্রুয়ারিতে হুমায়ুন দখল করলেন লাহোর। সরহিন্দে পঞ্জাবের শাসক সিকান্দারের সঙ্গে হুমায়ুনের যুদ্ধে সিকান্দার পরাজিত হলেন হুমায়ুনের কাছে, যদিও তাঁর সৈন্যবাহিনী হুমায়ুনের বাহিনীর থেকে বেশি ছিল। সরহিন্দ দখলের পরে (জুন ১৫৫৫) হুমায়ুন বাহিনী মহাপরাক্রমে দিল্লির দিকে

অগ্রসর হলেন।

এই পরিস্থিতিতেও সুরি বংশীয়রা নিজেদের মধ্যেকার বিরোধ বজায় রাখল। হুমায়ুনের কাছে পরাজিত দিল্লি আগ্রার শাসক ইব্রাহিম, আদিল শাহকে আক্রমণ করলেন। আদিলের হিন্দু সেনাপতি হিমু বা হেমচন্দ্র দু'বার পরাজিত করলেন ইব্রাহিমকে। প্রথমবার কাল্পির কাছে, দ্বিতীয়বার খানুয়ায়।

বঙ্গের সামসউদ্দিন মহম্মদ শাহ কাল্পির কাছে আদিল শাহ মুখোমুখি হলেন। আদিলের আহ্বানে হিমু এলেন কাল্পির কাছে। তার সঙ্গে মহম্মদ শাহের যুদ্ধে মহম্মদ পরাজিত হলেন। আদিল শাহ বঙ্গের দখল পেয়ে শাহাবাজ খানকে শাসক নিযুক্ত করে নিজে ফিরে এলেন তার প্রিয় আবাস স্থল চুনারে।

ইতিমধ্যে জানুয়ারি ১৫৫৬-তে হুমায়ুনের মৃত্যু হয়েছে এবং তার পুত্র আকবর তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। হিমু এই সংবাদ পেয়েই গোয়ালিয়র থেকে আগ্রার দিকে অগ্রসর হলেন সহজেই আগ্রা দখল হলো। আগ্রার ইসকান্দার মির্জা ভয়ে পালিয়ে গেলেন দিল্লি। হিমু এগোলেন দিল্লির দিকে। দিল্লির শাসক আর্দিবেগ খান হিমুর কাছে পরাজিত হলেন। হিমু আর্দির কাছে পেলেন ১৬০টি প্রশিক্ষিত হাতি, ১০০০ আরবীয় ঘোড়া এবং প্রচুর মূল্যবান অলংকারাদি। এইভাবে হিমু দিল্লি ও আগ্রার দখল পেলেন যা ছিল একান্তভাবে মুঘলদের।

এই সময়েই হিমুর মনে এক হিন্দু সম্রাটের অধীনে ভারতবর্ষকে আনবার প্রবল ইচ্ছা হলো, যে ইচ্ছাপূরণের যাবতীয় সঙ্গতি ও সামর্থ্য তাঁর ছিল। আবুল ফজল হিন্দুদের অধীনে ভারত সাম্রাজ্য তৈরি করার ধারণাটিকে অতিশয় বদচিন্তা মনে করলেন। সেকথা তিনি তাঁর প্রণীত ইতিহাস পুস্তকেও লিখেছেন যার ইংরেজি অনুবাদ এই রকম— Victories impressed him with evil ideas and his capature of Delhi increased his arrogance so that his intoxication became madness. কিন্তু ইউরোপীয় ইতিহাসবিদ ভিনসেন্ট স্মিথ অন্য মত পোষণ করেন। তাঁর ধারণায় হিমুর এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা অযৌক্তিক বা অনৈতিক ছিল না। তবে তিনি তাঁর নিয়োগ কর্তা আদিল শাহর পরিবর্তে নিজেকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু এটাও খারাপ কিছু ছিল না।

বাবর, হুমায়ুন, শেরশাহ যদি দাবিদার হতে পারে, হিমুর যা অভিজ্ঞতা ও সৈন্যবল ছিল তাতে তাঁর দিল্লি তথা ভারতের সম্রাট হওয়ার সবই লক্ষণ ছিল। তাই তিনি যদি ভারতের সম্রাট হওয়ার বাসনা পোষণ করে থাকেন তবে তা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না।

একথা ঠিক যে তার ব্যক্তিগত ইচ্ছাই বেশি প্রবল হয়েছিল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্ঘটনা না ঘটলে তাই-ই হতো। দিল্লি অধিকার করে তিনি উপাধি নিলেন বিক্রমাদিত্য। মাথায় রাজকীয় ছত্র, নিজের মুদ্রা তৈরি করলেন এবং নিজেকে স্বাধীন ঘোষণা করে নাম নিলেন— হেমচন্দ্র বিক্রমাদিত্য অথবা রাজাবিক্রমজিৎ।

বৈরাম বেগ পরে খান উপাধি পেয়ে হয়েছিলেন বৈরাম খাঁ। তিনি মৃত হুমায়ুনের নাবালক পুত্র (তখন ১৩ বছর) আকবরের অভিভাবক হয়েছিলেন। হিমু নিজেকে স্বাধীন রাজা ঘোষণা করার পর এবং বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বদাই তার বিজয়ী হওয়ার খবর জানা ছিল বৈরামের পরামর্শদাতাদের। তারা বৈরামকে পরামর্শ দিলেন ভারত ত্যাগ করে চলে যাওয়ার। কিন্তু বৈরাম হিমুর মুখোমুখি হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

ইতিহাসবিদ ভিনসেন্ট স্মিথের মতে হিমু যদি হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপন করার কথা ভেবেও থাকেন, তা বাস্তবায়িত করা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। হিমু কোনও অংশেই বাবর বা শেরশাহর থেকে কম ছিল না। খানুয়ার যুদ্ধে তার প্রমাণও পাওয়া গিয়েছিল। পানিপথে আকবর বাহিনীর মুখোমুখি হলো হিমুর বাহিনী। হিমুর সৈন্য সংখ্যা বৈরামের নেতৃত্বে আকবরের থেকে বেশি ছিল।

১৫৫৬ সালের ৫ নভেম্বর পানিপথে যুদ্ধ শুরু হলো। হিমু বাহিনী আকবরের সৈন্যবাহিনীর বাম ও ডান দুইদিকে আক্রমণ করে তাদের পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ করেছিল। এবার পনেরোশো হস্তীবাহিনী নিয়ে হিমু আকবর বাহিনীর কেন্দ্রস্থলে আক্রমণ করলেন। যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে হিমুর অনুকূলেই এল। এমন সময়ে একটি বিষাক্ত তির হিমুর একটি চোখে ঢুকে গেল এবং হিমু অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তাঁর মৃত্যু হয়েছে ধরে নিয়ে তাঁর বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। জ্ঞানহীন হিমুর দেহ নিয়ে যুদ্ধ হাতির মাহুত যখন হিমুকে একটি নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, শাহকুলি নামে এক মুঘল সেনাপতি দেখে ফেলে এবং আকবরের শিবিরে নিয়ে যায়। অভিভাবক বৈরাম খাঁর নির্দেশে আকবর মূর্চ্ছিত হিমুর দেহে তরবারির আঘাত করেন। এই ভাবেই হিমু ও আফগানদের ভবিষ্যৎ স্থির হয়ে গেল এবং নাবালক আকবর অভিভাবক বৈরামের নেতৃত্বে দিল্লি ও আগ্রার শাসক হয়ে গেলেন।

ভিনসেন্ট স্মিথ লিখেছেন, বৈরাম খাঁ চেয়েছিলেন আকবরকে গাজি বানাতে। কাফেরকে হত্যা করলেই গাজি হওয়া যায়। তাই নাবালক আকবর তার তলোয়ার দিয়ে বৈরামকে আঘাত করলেন। উপস্থিত অন্য মুসলমানরা তাদের তরবারি দিয়ে মৃতপ্রায় হিমুকে আঘাত করলেন এবং শেষে বৈরাম খাঁ হিমুর দেহ থেকে মস্তক তরবারি দিয়ে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন।

হিমুর কাটা মাথাটা কাবুলে পাঠানো হলো এবং দেহটা দিল্লির কোনও তোরণে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। এখানেই শেষ নয়। মুঘল বাহিনী আলোয়ার দখল করল। এই আলোয়ারেই হিমুর বসত বাড়ি। সেই বাড়িতে মুঘল বাহিনী থেকে কিছু জন গেল। তাদের সাক্ষাৎ হলো হিমুর বাবার সঙ্গে।

আবুল ফজল (আকবরের সভাসদ ও জীবনীকার) লিখেছেন— ওখানে একটি ছোটোখাটো যুদ্ধও হলো। হিমুর বাবাকে বন্দি করা হলো। তাকে আনা হলো নাসির-উল্-মুলকের কাছে। নাসির তাকে ধর্ম পরিবর্তন করে মুসলমান হতে বললেন। বৃদ্ধপিতা (হিমুর) উত্তর দিলেন দীর্ঘ ৮০ বছর ধরে আমি আমার ঈশ্বরের পূজা করেছি এই ধর্মে থেকেই। আজ কেন, তোমাদের ধর্ম সম্পর্কে কিছু না জেনেই কেবল প্রাণ বাঁচাতে ধর্ম পরিবর্তন করব? এক মুঘল সৈন্য তাকে হত্যা করে।

এই ভাবেই বীরগতি প্রাপ্ত হয় হিমুর পরিবার। একটি নগণ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও নিজের ক্ষমতায় ও সামরিক জ্ঞানে কালক্রমে হিমু দিল্লির রাজা হয়েছিলেন এবং ভারতের সম্রাটও হতে পারতেন। ভারতের ইসলামি যুগে এটি একটি অনবদ্য ঘটনা। □

মোদী সরকার কৃষক ও গরিবের প্রকৃত বন্ধু

কল্যাণ গৌতম

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন-মন্ত্র হলো 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস।' অর্থাৎ সকলকে নিয়ে চলা, সকলের সঙ্গে চলা, সকলের বিশ্বাস-আস্থা অর্জন করা এবং সকলকে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে শামিল করা। ভারতবর্ষের গরিব-গ্রামীণ-প্রান্তিক মানুষের জন্য সেবা-সুশাসন-কল্যাণের যে কর্মসূচি নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার বিগত বছরগুলিতে গ্রহণ করে এসেছে, তার সুফল আরও বেশি মাত্রায় পৌঁছে দেবার নামই উন্নয়ন। কৃষক- কেন্দ্রিক প্রকল্প রূপায়ণে কৃষকের আস্থা অর্জন সবচাইতে প্রথমে করা প্রয়োজন। তা করার জন্য কৃষিমন্ত্রকের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৫ সালে নতুন মন্ত্রকের নাম দেয় 'কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক' (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare)। কৃষকদের জন্য বৃহত্তর কর্মকাণ্ডের সূচনা যে হতে চলেছে, এই নাম পরিবর্তনের ইঙ্গিত থেকে বুঝে যায় তথ্যাভিজ্ঞ মহল। যেন-তেন প্রকারে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোই যে লক্ষ্য হতে পারে না, 'অন্নদাতা'দের জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন, কৃষি বিষয়ে প্রচলিত ধারণার উত্তরণ প্রয়োজন, তারই বার্তাবহ এই পরিবর্তন।

অন্নদাতাদের অসহায়তা ও দুর্দশার নানান রিপোর্ট পর্যালোচনা করে তাদের আয় দ্বিগুণ করতে প্রধানমন্ত্রী বিশেষভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন। সরকারের সহৃদয় নজর কৃষককুলের উপর বর্তেছে, তা পরিষ্কার বোঝা যায় রকমারি কৃষি যোজনাগুলি পর্যালোচনা করলে। কৃষি থেকে আয় বাড়বে যদি উৎপাদনশীলতা বাড়ে। এই আয় বৃদ্ধি অনেকাংশে নির্ভর করছে মাটির গুণমান বা স্বাস্থ্যের উপর। এই সরকারের 'সয়েল হেলথ্ কার্ড' প্রকল্প তারই ফলশ্রুতিতে ক্রিয়ারত। কৃষি ফসলের দাম সবসময় ওঠা-নামা করে। ফসল ওঠার প্রথম পর্যায়ে পণ্যের ব্যাপক জোগানে বাজারে দাম নেমে যায়। ফলে

ফঃ ৫

কমদামে চাষি ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হয়। তাতে কৃষকের লাভ কমে, ফড়ে-রা সেই সুযোগে কমদামে ফসল কিনে মজুত করে রাখে। পরে বেশি দামে অভাবী কৃষকের কাছেই তারা ফসল বিক্রি করে। যদি নানান ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বা মিনিমাম সাপোর্টিং প্রাইস বাড়ানো হয়, তবে চাষির ক্ষতি অনেকটা পুষিয়ে যেতে পারে। মোদী সরকার সবসময় চেষ্টা করেছে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাড়িয়ে কৃষককে সহায়তা ও সুরাহা দিতে এবং সেই মর্মে আয়ের সুযোগ বাড়িয়ে দিতে।

২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে মোদী সরকার 'প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা' চালু করছে। রোগপোকা, অনিয়ন্ত্রিত আবহাওয়ার কারণে ক্ষয়ক্ষতি এই বিমা প্রকল্পে আওতাভুক্ত হওয়ার ফলে কৃষকের দুশ্চিন্তা কমে গেল। কৃষক মনের আনন্দে ফসল ফলাতে লাগলেন। তাতে দেশে সামগ্রিক কৃষি উৎপাদন ক্রমাগত বাড়লো। যদি কোনো কারণে ফসল নষ্ট হয়, ক্ষতিগ্রস্ত চাষি তার বিমার টাকা পেয়ে ক্ষতি সামলে নিতে পারবেন। এই মনোবল ভারতীয় কৃষকের একটি বড়ো আস্থার জায়গা।

এই সরকার ভরতুকি ব্যবস্থাকে যুগসন্ধিক্ষণের স্বচ্ছতার স্তরে, দুর্নীতি মুক্তির স্তরে নিয়ে গেছে। 'প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা'-র মতো ব্যাংকিং পরিষেবায় টাকাপয়সা সরাসরি গ্রাহকের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে, তাতে দুর্নীতি দূর হচ্ছে। দেশের জলবায়ু ও মাটি বৈচিত্র্যের মধ্যে কৃষি ব্যবস্থা আদ্যিকালের ধ্যানধারণায় আঁকড়ে থাকা উচিত নয়, ক্রমাগত চেষ্টায় মোদী সরকার

কৃষি উন্নয়নের নিরিখে বর্তমান সরকারের যে

১. ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষেত্রে কৃষককে রক্ষা করা ও আগলে রাখার মানসিকতা এই সরকারের পুরোদমে রয়েছে।

২. MSP বা মিনিমাম সাপোর্টিং প্রাইস বৃদ্ধি করেছে এই সরকার। খরচের ৫০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি করে ধার্য করা হয়েছে ফসল বিক্রির ন্যূনতম মূল্য, যাতে অভাবী বিক্রি করে দিতে বাধ্য না হয় চাষি, ফসল চাষ করে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে।

৩. কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি (PMKISAN) প্রকল্পের অধীনে ১১ কোটিরও বেশি কৃষককে ন্যূনতম আর্থিক সহায়তা হিসেবে প্রতিবছর ৬,০০০ টাকা পর্যন্ত দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এ বড়ো কম কথা নয়। চাষ করে, ফসল বিক্রি করে লাভ তো আছেই, বিমা করা আছে ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হলে, তার উপর বছরে এই অতিরিক্ত নিশ্চিত টাকা কৃষককে চাষের মধ্যে থাকতে আশ্বস্ত করেছে।

৪. শাস্ত্রে আছে 'কৃষিমিৎ কৃষস্ব' অর্থাৎ চাষই কেবল করো। এটাই কৃষককে সম্মান জানানোর জন্য সরকারি প্রচেষ্টা। ফসল বিমার যে বন্দোবস্ত কেন্দ্রীয় সরকার করেছে, তার জন্য প্রিমিয়ামের পরিমাণ যৎসামান্য। অথচ ফসল ফলাতে গিয়ে নানাভাবে চাষ মার খেলে কৃষক তার প্রাপ্য টাকা ফসল বিক্রি ছাড়াই পেয়ে যাবেন। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা খাতে ১.৩৩ লক্ষ কোটি টাকা কৃষকের দাবি সরকার মেনে নিয়েছে। বিমার টাকা পাবার পথ আরও সহজ ও সাধাসিধে হয়েছে।

৫. একটি প্রবাদ আছে 'আশায় মরে চাষা'। কৃষকদের বৃষ্টির জন্য প্রকৃতির দিকে চেয়ে থাকতে হতো। সব জায়গায় তো আর বড়ো নদী পরিকল্পনায় সেচের জলের সুবিধা নেই! বৃষ্টির উপর থেকে নির্ভরতা কমিয়ে দিতে পেরে কৃষিকাজকে নিশ্চিত করেছে এই সরকার। যদিও অন্য পরিকল্পনায় বর্ষার জল ধরা ও জল ভরার প্রাকৃতিক প্রকল্পের সদ্ব্যবহারও রয়েছে। মোট ৭৭, ৫৯৫ কোটি টাকা নিয়োজিত করে ৯৯টি ইরিগেশন প্রকল্প হাতে নিয়েছে এই সরকার, যা কৃষিক্ষেত্রে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পে যুগান্তকারী উদ্যোগ।

৬. সর্বকালের জন্য সবচেয়ে বেশি খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছে এই সরকারের আমলেই। ২০১৩-১৪ সালে যেখানে ২৬৫.০৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদত হয়েছিল, ২০২২-২৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২৩.৫৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি দেশ হয়ে উঠেছে ভারতবর্ষ। কৃষিক্ষেত্রে সর্বোত্তম গরিমাময় একটি দেশ, ভারত।

৭. কৃষকের এখন আয় বৃদ্ধির নানান পথ খুলে দেবার চেষ্টা করছে এই সরকার। ব্যারেন ল্যান্ড বা পতিত আকর্ষিত জমিতে সৌর প্যানেল বসিয়ে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

৮. চেষ্টা চলছে দুধ উৎপাদন বাড়িয়ে গোয়ালাদের

তাই তিন হাজার কৃষি স্টার্টআপের কাজ শুরু করেছে। স্টার্টআপগুলির লক্ষ্য দেশকে জ্ঞানভিত্তিক ও প্রযুক্তিচালিত অর্থনীতিতে পরিণত করা। সময়োপযোগী তথ্যের নাগাল কৃষককে পাইয়ে দেওয়া। ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে সরকার ১৯ দফা 'স্টার্টআপ ইন্ডিয়া অ্যাকশন প্ল্যান' প্রণয়ন করে। এগুলির কার্যক্ষেত্র হলো কৃষি-প্রযুক্তি, পশুপালন, জৈবচাষ, নির্দিষ্ট লাভজনক ফসল চাষ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ইত্যাদি। উৎপাদিত ফসলের সঙ্গে বাজারের সংযোগ করিয়ে দেওয়া, 'Farm to Fork' বা কৃষিক্ষেত্র থেকে খাবারের গ্রাস পর্যন্ত তার বৃহত্তর পরিধি।

২০২৩-২৪ সালের বাজেটে ঘোষিত হয়েছে কৃষিক্ষেত্রে উদ্ভাবনে গতি সঞ্চারের জন্য কৃষি ত্বরণকারী তহবিল গঠন। এর লক্ষ্য আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে কৃষি রীতিনীতির রূপান্তর, চাষ থেকে লাভের অনুপাত বাড়ানো

কথাগুলি মানুষ মনে রাখবে

আয় বাড়াতে। ২০১৪-১৫ সাল থেকে ২০২১-২২ সালে বার্ষিক দুধ উৎপাদন বেড়েছে ৫১.০৫ শতাংশ।

৯. মৎস্য উৎপাদন বাড়াতে পৃথক মন্ত্রক তৈরি হয়েছে। যথার্থ 'নীল বিপ্লব' (Blue Revolution) আসবে এই মৎস্য উৎপাদন বাড়িয়ে।

১০. বিগত নয় বছরে মধুর উৎপাদন বেড়েছে তা নয়, বিদেশে রপ্তানির পরিমাণ দ্বিগুণ হয়েছে। একেই বলা যায় মিষ্টি বিপ্লব (Sweet Revolution)।

১১. ২০১৩-১৪ সালের চাইতে ২০২১-২২ সালে কৃষিক্ষেত্রকে কাজে লাগিয়ে ইথানল তৈরির পরিমাণ ৩৮ কোটি লিটার থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৩৪ কোটি লিটার।

১২. রাষ্ট্রসঙ্ঘ ২০২৩ সালকে International Year of Millets বা আন্তর্জাতিক গৌণ দানাশস্যের বছর বা 'শ্রীঅন্ন বছর' বলে চিহ্নিত করেছে। এই কোর্স গ্রেইন বা মোটা দেশীয় দানাশস্যের মধ্যে প্রভূত পুষ্টিমূল্য রয়েছে যা দেশের পুষ্টি নিরাপত্তার জন্য একটি দারুণ উৎস। এগুলি সাধারণ মানুষের ফসল, এগুলিকে বিশ্বের বাজারে ছড়িয়ে দিতে প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে মোদীজীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার। ভারতবর্ষ এই উদ্যোগের একটি উল্লেখযোগ্য দেশ। কারণ বহু বিচিত্র শ্রীঅন্ন যেমন জোয়ার, বাজরা, রাগি, কোদো, মারুয়া ভারতে উৎপন্ন হয়।

এই প্রস্তাব রাষ্ট্রসঙ্ঘে ২০২১ সালের মার্চ মাসে ভারতই উত্থাপিত করে এবং ৭২টি দেশ তা সমর্থন করে। এভাবেই ২০২৩ সালে পালিত হয়েছে মিলেট বর্ষ বা শ্রীঅন্ন বর্ষ। গরিব মানুষকে তাদের হাতের নাগালে থাকা পুষ্টিকর শস্য-সম্পদে ভরিয়ে দিতে হবে গোলা।

১৩. এবছর সমবায় ক্ষেত্রে 'বিশ্বের বৃহত্তম শস্য গোলা' তৈরিতে সরকার সহায়তার কথা ঘোষণা করেছে। এই পরিকল্পনায় প্রাথমিক কৃষি ঋণে সমিতি স্তরে গুদাম নির্মাণ, প্রক্রিয়াকরণ কারখানা নির্মাণ-সহ নানান কৃষি পরিকাঠামো তৈরি হবে। যেন বিশ্বের অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার তৈরি হবে ভারতে। খাবারের জন্য কোনো দেশের পক্ষেই ভারতকে চোখ রাঙানো সম্ভব হবে না।

গরিব মানুষের বিশেষ করে গ্রামের মানুষের জন্য মোদী সরকার কী কী করেছে!

- ৮০ কোটির বেশি মানুষ বিনামূল্যে খাদ্যশস্য পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনায়।
- প্রায় ১২ কোটি বাসিন্দার কাছে পৌঁছে গেছে কলের জল।
- ৩ কোটির বেশি মানুষ গ্রামে ও শহরে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় গৃহলাভ করেছেন।
- প্রায় ১২ কোটি টয়লেট তৈরি হয়েছে স্বচ্ছ ভারত প্রকল্পে।
- প্রায় ৩৫ লক্ষ রাস্তার হকার PM SVANidhi প্রকল্পে ঋণ পেয়েছেন।
- প্রায় ৪০ কোটি ঋণ আবেদন মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোগপতিদের জন্য মঞ্জুর করা হয়েছে।
- সাংবিধানিক স্ট্যাটাস দেওয়া হয়েছে ন্যাশনাল কমিশন অব ব্যাকোয়ার্ড ক্লাসকে।
- প্রায় ২০ কোটি মহিলার কাছে করোনা পরিস্থিতিতে অর্থ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।
- স্ট্যাণ্ডআপ ইন্ডিয়া প্রকল্পের মাধ্যমে ৭৩৫১ কোটি টাকা তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ পেয়েছেন।
- বর্তমান ভারতবর্ষে ৬০ শতাংশ মন্ত্রী এসসি, এসটি বা ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত।
- ২০১৪ সালের আগে যত না একলব্য আবাসিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার চাইতে ৫ গুণ বেশি বিদ্যালয় তৈরি হয়েছে ২০১৪ সালে মোদী সরকার আসার পর।
- বিভিন্ন প্রদেশ মিলিয়ে ১১৭টি অ্যাসপিরেশনাল জেলা গঠিত হয়েছে উন্নয়নের নিরিখে। এরকম আরও অনেক কাজের ফিরিস্তি দেওয়া যেতে পারে।

এবং গ্রামে যুব পরিচালিত কৃষি স্টার্টআপের প্রসার যেমন কৃষিতে ড্রোন স্প্রে, এরিয়াল রোবোটিক্স, মাটির মাপকাঠি পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি।

২০২৩ সালকে আন্তর্জাতিক মিলেট (রাগি, বাজরা, জোয়ার, কোদো, মারুয়া ইত্যাদি) বর্ষ হিসেবে চিহ্নিত করেছে এই সরকার। ভারতীয় এই ফসল সম্ভার যা একসময় আমাদের অনুধ্যানের বাইরে ছিল, তা এখন বিশ্ববাজারে পৌঁছাবে, নানান পুষ্টিকর খাবার তৈরি হবে, গরিব মানুষ যারা এই ফসলচাষ করেন তাদের কাছে তার লাভ পৌঁছে যাবে। মিলেটের প্রচারে সরকারের পরিকল্পনা হচ্ছে মিলেটের রপ্তানি বৃদ্ধি, কৃষকদের খাদ্য নিরাপত্তা এবং বিশ্বজুড়ে ভারতীয় মিলেটের উচ্চ পুষ্টিমূল্য জনপ্রিয়

করা। এ বিষয়ে বহু স্টার্টআপ সময়োপযোগী কাজ সম্পন্ন করেছে।

কীভাবে প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে তার একটি প্রাসঙ্গিক তালিকা দেওয়া হলো—

১. যে সমস্ত দরিদ্র কৃষক প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনার আওতায় আছেন, তার ৭১ শতাংশ কৃষকই এসসি/এসটি/ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত।

২. পিএম কিষান প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের মধ্যে ৮০ শতাংশ এসসি/এসটি/ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত।

৩. যে গৃহ যেগুলি PMAY(G) প্রকল্পে নির্মিত হয়েছে তার ৪৫.৪৫ শতাংশ এসসি অথবা এসটিদের। স্কলারশিপ গ্রহীতাদের ৫৮ শতাংশ এসসি/এসটি/ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত।

৪. চল্লিশ কোটি মুদ্রা যোজনায় সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষের ৫১ শতাংশ এসসি/এসটি/ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত।

কৃষকের মঙ্গলের জন্য কত বৃহৎ ও ব্যাপক উন্নয়নের প্রচেষ্টা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার

১. ২০১৩-১৪ সালের চাইতে ২০২২-২৩ বর্ষে ৫.৭ গুণ বাজেট বরাদ্দ কৃষিখাতে বেড়েছে।

২. কৃষি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ডে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে ১ লক্ষ কোটি টাকা।

৩. ১১ কোটির অধিক কৃষক পিএম কিষান প্রকল্পে উপকৃত হয়েছেন।

৪. প্রায় ২৩ কোটি সয়েল হেলথ কার্ড বা মৃত্তিকা স্বাস্থ্যের বিবরণী নথি বিতরণ করা হয়েছে, যা থেকে মাটির গুণগত মান জানতে পারবেন কৃষকেরা এবং তার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ করতে সমর্থ হবেন।

৫. ২০১৩-১৪ সালের চাইতে ২০২১-২২ অর্থবর্ষে নন-বাসমতি চাল রপ্তানি ১০৯.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬. তৈলবীজের ক্ষেত্রে মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস কৃষকদের প্রদান করে যে সংগ্রহ অভিযান চলেছে, তা ১৫০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে দেশে তৈলবীজ উৎপাদন প্রভূত বৃদ্ধি পায়।

৭. ডালশস্যের ক্ষেত্রে মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস কৃষকদের প্রদান করে যে সংগ্রহ অভিযান চলেছে, তা ৭৩৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে দেশে প্রোটিন সমৃদ্ধ আহার ডালচাষ বৃদ্ধি পায়।

৮. ২০২১-২২ এর চাইতে ২০২২-২৩ বর্ষে সারে ভরতুকি বেড়েছে ৫০০ শতাংশ।

৯. ২০২৩-২৪ বর্ষে কৃষি খাতে ঋণদানের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ২০ লক্ষ কোটি টাকা।

১০. প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা খাতে ১.৩৩ লক্ষ কোটি টাকার দাবি মঞ্জুর করা হয়েছে। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক বিমার টাকা পেয়ে ক্ষতি সামলাতে পেরেছেন।

১১. চাষ করতে লাগে জল। ২০২১-২৬ এই পাঁচ বছরের জন্য প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনা বা সেচের জল জোগানের পরিকল্পনায় ৯৩.০৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

১২. ই-নাম (eNAM) প্রকল্পের আওতায় ১,২৬০টি মান্ডি এসেছে এবং কৃষি সামগ্রী বেচা-কেনার কাজে গতি এনেছে।

দেশপ্রেমে ভরপুর ছবি আর্টিকেল ৩৭০

দেবাশিস লাহিড়ী

প্রথম দিনেই অর্থাৎ গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ছবিটি দেখলাম। এক কথায় ২ ঘণ্টা ৪০ মিনিটের সিনেমা, অনবদ্য এক দেশপ্রেমের গল্প, রাজনীতি সম্পৃক্ত ঘটনা কিংবা জটিল আইনকে ছাপিয়ে যথাযথ আইনের শাসনে জম্মু-কাশ্মীরকে গোটা দেশের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার কাহিনি। চোখের পলক পড়তে দিচ্ছে না। বাস্তব ঘটনা থেকে অনুপ্রাণিত এই ছবি। ভাবলাম, দুদিন আগেই সুপ্রিম কোর্ট রায় দিল যে ৩৭০ ধারার বিলুপ্তীকরণ সংবিধানসম্মত। এত তাড়াতাড়ি এটা সিনেমাতে এসে গেল!

তবে এই সিনেমা নায়িকা-কেন্দ্রিক। এখানে নারীশক্তি এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট। বাস্তবে যাঁর নাম সাহিদা পারভিন গাঙ্গুলী। আইপিএস এবং জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের এসিপি ছিলেন। যিনি প্রত্যেকদিন লোমহর্ষক এনকাউন্টার করতেন জঙ্গি মোকাবিলায়। বুরহান ওয়ানি যাঁর গুলির শিকার হয়েছিল। যিনি ৫ বছর জম্মু-কাশ্মীর SOG-তে পোস্টিং ছিলেন। গিনেস বুক অব রেকর্ডে যার নাম সাহসীদের তালিকায় স্থান পেয়েছে। তাঁর বাবা জম্মু-কাশ্মীর ব্যাংকের আধিকারিক ছিলেন। আবদুল্লাদের স্ক্যাম ধরার জন্য তাঁকে মেরে ফেলা হয় এবং তা আত্মহত্যা হিসেবে দেখানো হয়েছিল।

এই সিনেমায় সাহিদা পারভিন গাঙ্গুলী— জুনি হাকসার নামে পরিচিত । তাঁর ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেছেন ইয়ামি গৌতম।

জঙ্গিদের সঙ্গে তাঁর এনকাউন্টারগুলো যে কোনো অ্যাকশন ছবির চেয়ে কম নয়। একেবারে দমবন্ধ করা লোমহর্ষক দৃশ্য। কাশ্মীর ঘাঁটিতে শ্যুটিং হয়েছে আড়াই মাস ধরে। ছবির দ্বিতীয়ার্ধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা আসার পর মাত্রাটাই যেন পালটে গেল। দর্শকরা তাঁদের দেখামাত্র উল্লাসে ফেটে পড়লেন। পুলওয়ামার নিহত সৈনিকদের কফিনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীর সেই হুংকার— 'আর সহ্য করব না'। অমিত শা'র পার্লামেন্টের সেই বিখ্যাত ভাষণ— 'হম জান দে দেঙ্গে ইসকে লিয়ে'।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন রামানন্দ সাগরের বিখ্যাত রামায়ণ ধারাবাহিকের রাম তথা অরুণ গোভিল। কিরণ কর্মকার অভিনয় করেছেন অমিত শা'র ভূমিকায়। আর একজন মহিলা যিনি কাশ্মীরের মেয়ে, এখন বাঙ্গালি, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সচিব (পিএমও-৪) রাজেশ্বরী স্বামীনাথন, যাঁর ওপর পুরো দায়িত্ব ছিল ৩৭০ ধারা বিলুপ্তীকরণের। তাঁর ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেছেন প্রিয়া মানি।

সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটগুলি। খুবই সরলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে ৩৭০ ধারার আইনি খুঁটিনাটি যা সাধারণের বোধগম্য।

ছবির পরিচালক আদিত্য সুহাস জাম্ভলে। প্রযোজক আদিত্য ধর ও লোকেশ ধর, যাঁরা কাশ্মীরের মূল বাসিন্দা, সঙ্গে জ্যোতি দেশপাণ্ডে। লেখক আদিত্য ধর ও মোহন থাক্কর। সবাইকে নিয়ে দেশপ্রেমে ভরপুর এই ছবি দেখার মতো। প্রথমদিনেই ছবি রোজগার করেছে ২০ কোটি টাকা। □

পুরাণকথা

নবাঙ্কুর

শবরীর প্রতীক্ষা

পঞ্চবটী বন। বনের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে গোদাবরী নদী। এই পঞ্চবটী বনে গোদাবরীর তীরে একটি ছোট্ট কুঁড়েঘরে থাকে শবরী। কুৎসিত ও কদাকার বলে মা-বাবা তাকে শিশুকালেই ত্যাগ করেছে। শ্বশুড়বাড়ির লোকেরাও ত্যাগ করেছে।

কিন্তু দুঃখিনী শবরীর ভাগ্য ছিল অন্যরকম। গোদাবরী নদীর তীরে যে সব মুনি ঋষি বাস করেতন, তাঁরাও শবরীর মুখদর্শন করেন না। নদীতে স্নান করার অধিকারও তার নেই। মানুষ হয়েও সে মানুষের অস্পৃশ্য।

শবরীর কিন্তু এতে দুঃখ নেই। যারা তাকে ঘৃণা করে তাদেরও সে সেবা করে। সারাদিন বনে ঘুরে ঘুরে শুকনো কাঠ জমা করে। তারপর গভীর রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে ঋষিদের আশ্রমে সেই কাঠ রেখে আসে। যে পথে লোকের চলাচল সেই পথ সে প্রতিদিন পারিষ্কার করে রাখে। পথের সামান্য কাঁটাটি পর্যন্ত সযত্নে তুলে ফেলে দেয়। শবরীর এই নীরব সেবা একদিন ধরা পড়ে যায় এক বৃদ্ধ ঋষির কাছে। তিনি তাকে কন্যাস্নেহে বুকে টেনে নেন।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর শবরী একমনে তার গুরুর শিক্ষানুযায়ী রামনাম জপ করে যায় আর আগের মতোই ঋষিদের সেবা করে যায়। গুরুদেবের বয়স হয়েছে। তিনি একদিন শবরীকে বললেন– মা,আমার কাল পূর্ণ হয়েছে। ইচ্ছা ছিল শ্রীরামচন্দ্রকে নিজের চোখে দেখবো কিন্তু তার আর সময় নেই। তিনি এই পঞ্চবটীতে আসবেন। আশীর্বাদ করি তুমি তাঁকে দেখে ধন্য হবে।

গুরুদেব দেহত্যাগ করলেন। কয়েকদিন পর শবরীর মনে হলো গুরুদেব শ্রীরামচন্দ্রের কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, শ্রীরামচন্দ্র আসবেন পঞ্চবটীতে। পঞ্চবটী হবে তীর্থস্থান। শবরী প্রত্যহ ভোরে স্নান করে জল আনে, ফুল তোলে, বন থেকে খুঁজে খুঁজে মিষ্টি ফল আনে। তারপর বসে থাকে কুটিরের দরজায় প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের অপেক্ষায়।

বছরের পর বছর চলে যায়। শবরীর প্রতীক্ষা চলতে থাকে। বয়স বাড়ে। অনাহারে, অনিদ্রায় তার শরীর ভেঙে পড়ে। তবু শ্রীরামচন্দ্রের দেখা মেলে না, তিনি আসেন না। হঠাৎ একদিন শবরী দেখতে পেল পঞ্চবটীর নতুন রূপ। এ রূপ সে জীবনে কখনো দেখেনি। সমস্ত বনভূমির গাছের শাখায় শাখায় বিচিত্র বর্ণের ফুলের মেলা। পাখির কূজনে চারিদিক মুখরিত।

শবরী সেদিন তার কুঁড়েঘরের দ্বারে বসে শ্রীরামচন্দ্রের কথাই ভাবছিল। এমন সময় কে যেন তার নাম ধরে ডেকে উঠল। শবরী চমকে উঠল। আবার ডাক শুনতে পেল। মধুর কণ্ঠে নিজের নাম শুনতে পেয়ে সে দিশেহারা হয়ে পড়ল। শবরী উঠে দাঁড়াল। সামনে যাঁকে দেখতে পেল তাঁর মতো রূপ সে জীবনে দেখেনি। সে রূপের লাবণ্য দেখে জুড়িয়ে যায় দুচোখ।

শবরী অভিভূত হয়ে পড়ল। খানিকক্ষণ সে কথা পর্যন্ত বলতে পারল না। শেষে বুঝতে পারল স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র তার সামনে দাঁড়িয়ে। ভক্তের ডাকে ভগবান তবে এতদিনে এলেন! আনন্দে, আবেগে শবরী শ্রীরামচন্দ্রের পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন– মা, আমি এসেছি। শবরী কুটির থেকে আসন এনে দুই ভাইকে বসতে দিলেন। পাতার ঠোঙায় আনা ফল টক না মিষ্টি চেখে দেখে দেখে নিজের হাতে খাইয়ে দিলেন।

ভক্ত ও ভগবানের মিলন হলো। অপূর্ব মিলন। তাই পঞ্চবটী আর গোদাবরী পুণ্যতীর্থ হয়ে রইল।

শ্যামাপদ সরকার

নদ-নদী পরিচয়

মহানন্দা

মহানন্দা নদী নেপালের দক্ষিণ-পশ্চিম হিমালয়ের মহালদিরাম পাহাড় থেকে উৎপত্তি হয়ে কার্শিয়াং ও শিলিগুড়ি অতিক্রম করে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ হয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলা ও মালদা জেলার মধ্যে দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে ভোলাহাটের কাছে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশে এই নদী পদ্মানদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। মহানন্দা নদী একসময় বেশ চওড়া ও গভীর নদী ছিল। এর বুকে চলাচল করত বড়ো বড়ো মালবাহী নৌকা। বর্তমানে নদীটি শীর্ণকায় এবং দূষণে পরিপূর্ণ।

এসো সংস্কৃত শিখি-১৫

তত্র – সেখানে।

গৃহং কুত্র অস্তি? বাড়ি কোথায়?

গৃহং তত্র অস্তি। বাড়ি সেখানে।

অভ্যাস করি—

মন্দির কুত্র অস্তি?–মন্দির কোথায় আছে?

মন্দির তত্র অস্তি। – মন্দির সেখানে আছে।

দ্বিচক্রিকা (সাইকেল) কুত্র অস্তি?–দ্বিচক্রিকা তত্র অস্তি।

বৃক্ষ কুত্র অস্তি?– বৃক্ষ তত্র অস্তি।

শিক্ষক: কুত্র অস্তি? – শিক্ষক: তত্র অস্তি।

ঘটী কুত্র অস্তি? – ঘটী তত্র অস্তি।

দ্বারং কুত্র – ? দ্বারং – অস্তি।

পাদরক্ষা – – ? পাদরক্ষা – –।

সোপানং – – ? – – অস্তি।

তত্র দ্বারা দু'তিনটি বাক্য রচনা করেত হবে।

তত্র কিং কিম অস্তি?

ভালো কথা

উকুনদাদি

আমাদের গ্রামের মনুয়ার দাদির বয়স ৮৫ বছর। কিন্তু দাদির মাথাভরা চুল। সব চুল সাদা। আর দাদির মাথাভর্তি উকুন। দাদি দুপুরে ওদেরই একটা গাছের তলায় এসে বসে। আর তখনই দুটো বাঁদর এসে দাদির ঘাড়ে বসে উকুন বেছে বেছে খেতে শুরু করে। বাঁদর দুটোর সঙ্গে দাদির খুব ভাব। আমরা কাছে যেতে চাইলেই ওরা দাঁত বের করে তেড়ে আসে।। দাদি বলে, উকুন মারা নাকি পাপ। কিন্তু বাঁদরে খেলে নাকি পুণ্য হয়। আমরা দাদিকে উকুন দাদি বলে ডাকি। তাতে দাদি রাগ করে না।

মৌসুমি মাহাত, সপ্তম শ্রেণী, রানিবাঁধ, বাঁকুড়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) র র ঘ য়া

(২) ই ঘ জা র

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) ছো ছে রা লে ক

(২) ন ধা জী রা ব

৪ মার্চ সংখ্যার উত্তর

(১) উৎপাদন (২) উত্তরপত্র

৪ মার্চ সংখ্যার উত্তর

(১) অহিতসাধন (২) আকাশকুসুম

উত্তরদাতার নাম

(১) শিবম রায়, রায়নগর, ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগনা। (২) অনামিকা পাল,শিলচর, অসম (৩) প্রীতিজা মাঝি, হৈবৎপুর,পূঃ মেদিনীপুর। (৪) অন্বেষা পাল, কাঁচরাপাড়া, উঃ ২৪ পরগনা

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪

৯০৫১৭২১৪২০

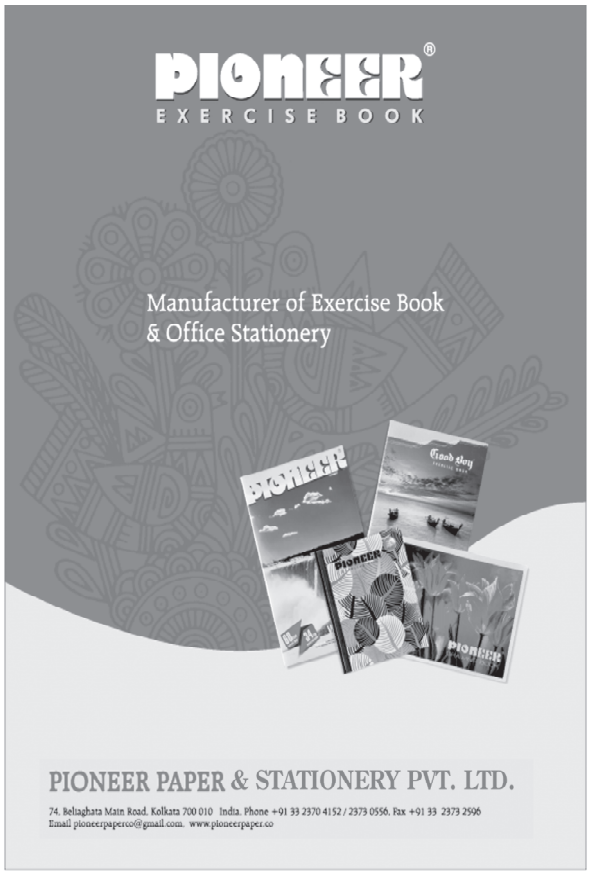

With Best Compliments from -

A

Well wisher

জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে বসানোর রায় দিন

রামব্রহ্ম দেবশর্মা

১. অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের ডঙ্কা বাজলো। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। তাই সমগ্র মানবজাতির নজর এই দেশ এবং নির্বাচনটি ঘিরে। দেশের নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ভোটকর্মী এবং সংবাদমাধ্যমের ব্যস্ততা ও তৎপরতা এই সময় সর্বোচ্চ স্তরেই থাকে। তবে একজন তন্বিষ্ট-ভোটার হিসেবে, সাধারণ মানুষ হিসেবে একটি বড়ো দায়িত্ব কিন্তু রয়ে যায়। সেটা হলো সেরা ও উপযুক্ত প্রার্থীকে নির্বাচিত করে সংসদে পাঠানো, নির্ভরযোগ্য দলের হাতে দেশের শাসনভার ন্যস্ত করা, যাতে বিদেশিশক্তি ভারতবর্ষকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, চীন ও পাকিস্তানের মতো প্রতিবেশী দেশ ভারতকে নাকানিচুবানি খাওয়াতে না পারে তার ব্যবস্থা করা। বিদেশি ষড়যন্ত্রে ভারতেই ছদ্মবেশ ধারণ করে থাকা দেশীয় এজেন্টদের চক্রান্তে যাতে দেশটি ছারখার হয়ে না যায়, তার ব্যবস্থা করা। নির্বাচন করার কাজটি কঠিন এজন্যই যে আমরা অনেকসময় দেশের শত্রুকে সঠিকভাবে চিনতে পারি না। খবরের কাগজ এবং ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ক্রমাগত মিথ্যা প্রচারে আমরা অনবরত বিভ্রান্ত হই। যে সংবাদমাধ্যম অর্ধসত্য সংবাদ পরিবেশন করে, তারা ভোটের সময়ও মরিয়া হয়ে যায় ভোটারদের ঠকিয়ে অসৎ ও দেশবিরোধী দলের পক্ষে ভোটবাক্স ভরিয়ে দিতে। যেহেতু কাগজে প্রকাশিত সংবাদকে ভোটাররা বেদবাক্য মনে করেন, তাই প্রতারণার সম্ভাবনা থেকে যায়। যারা সাময়িকভাবে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েন, তারা ভোটের সময় সঠিকপক্ষ অবলম্বন করতে পারেন না। প্রস্তুত আলোচনায় আমরা নির্মোহদৃষ্টিতে দেখাবো যোগ্য প্রার্থী এবং যোগ্য দল বেছে নেবার উপায় কী আছে! সকাল সকাল সপরিবারে কষ্ট করে লাইনে দাঁড়িয়ে নিজের ভোট নিজে কেন দেবো? নোটা-তে বোতাম টেপা কেন অনুচিত— এইসব বিষয়েই প্রস্তুত আলোচনা হবে।

২. ভোটারের প্রথম কাজ হচ্ছে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাইয়ের ভাবনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়া। গুন্ডাবাহিনীর পেশীশক্তি, দুর্নীতির আবহ, সংবাদমাধ্যমের মিথ্যা বুলি সত্ত্বেও একজন ভোটার যোগ্য এবং সেরা প্রার্থী খুঁজবেন কীভাবে? ভোটারকে এজন্য 'ভোট-গোয়েন্দা' হতে হবে। প্রকৃত গোয়েন্দা কারও দ্বারা প্রভাবিত হন না; সবদিক ভেবেচিন্তে নিরাপরাধ ব্যক্তিদের অপরাধীর তালিকা থেকে আগে বাদ দিতে থাকেন। প্রার্থী বিচারেরও সবচাইতে সেরা পদ্ধতি হলো অসৎ ও অযোগ্যদের আগেই তালিকা থেকে সরিয়ে রাখা। যে প্রার্থী আপনাকে বোকা বানিয়ে আগে জিতেছে, যে দুর্নীতির পাঁকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত রয়েছে, অথবা যে ব্যক্তির কাছে রাজনীতি টাইম-পাস, যে জেতার পর সাধারণ মানুষকে ভুলে যায়, পরিষেবা দেবার ক্ষেত্রে দলীয় সমর্থকদেরই সবকিছু পাইয়ে দেয়, তোষণের রাজনীতি করে, ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিপরীতে কথা বলে, মা-বোনের শ্লীলতাহানির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে শামিল হয় না, বাংলা ভাষার উপরে নেমে আসা মরু-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কথাটি কয় না— আপনি নিশ্চয়ই তাকে ভোট দিয়ে 'আত্মঘাতী' হতে চাইবেন না!

ভোট দেবার আগে আপনাকে ভাবতে হবে— সৎ, দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ ব্যক্তি কে রয়েছেন? কে সত্যিই আপনার সমস্যা সংসদে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে পারবেন, আপনার জন্য সুবিচার এনে দিতে পারবেন। এমন উপযুক্ত প্রার্থীই আপনি নির্বাচন করুন।

৩. কোন দলের হাতে দেশের শাসনভার নিরাপদ তা ঠিক করবেন কীভাবে? প্রথমে বুঝে নিন নির্বাচনটির বিস্তৃতি— লোকসভা, বিধানসভা, পুরসভা না পঞ্চায়েত ভোট এটি! যেহেতু ২০২৪-এর ভোট লোকসভা নির্বাচন, যেহেতু এটি প্রধানমন্ত্রী সুনিশ্চিত করার ভোট, তাই এমন দলকে ক্ষমতায় রাখবো যে দলে প্রধানমন্ত্রীর মুখটি সর্বোত্তম ও উজ্জ্বল ভাবেই রয়েছে, ধোঁয়াশা নেই, নানাভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা করার প্রয়োজন নেই। এমন দলকে জেতাবো, যে দল দেশের নিরাপত্তা অটুট রাখতে সক্ষম হবে, যে দল দেশের সার্বভৌমত্ব, স্বাভিমান রক্ষায় বদ্ধপরিকর হবে। দেশের হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্যকে পদদলিত করে চলে যাবে না যে দল— তাদের পক্ষেই মূল্যবান ভোটটি অর্পণ করে নিশ্চিন্তে কালাতিপাত করতে পারবো আমরা। আমরা চাইবো না আমাদের দেওয়া ভোটটি নষ্ট হোক। আমরা চাইবো চারিদিক বিবেচনা করে যে দলকে ভোট দিলাম সেই দলই যেন ভারতের শাসনভার গ্রহণ করে। উন্নতির লক্ষ্যে সমগ্র দেশ যে সদর্থক পথে চলছে এবং ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে, পশ্চিমবঙ্গ যেন তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায়! নোয়াখালির বীভৎস স্মৃতি নিয়ে সন্দেশখালির মতো অসংখ্য প্যাকেট ও পকেট যাতে তৈরি হয়ে না যায়। দেশে শক্তিশালী সরকার যে দল দিতে পারে, মজবুত অর্থনীতি যে দলের লক্ষ্য, সামাজিক স্থিতি যে দলের প্রাথমিকতা— তাকেই ভোট দিতে হবে। পাকিস্তান ও চীনের মতো শত্রুভাবাপন্ন প্রতিবেশী পাশেই রয়েছে এটা মাথায় যেন থাকে। সাধারণ ভোটার সবসময় চান ভারতের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গও সবদিক থেকে বিকশিত হোক। যে রাজনৈতিক দলের হাতে দেশের সার্বিক সমৃদ্ধি ঘটবে, দেশমাতা গৌরবশালিনী হবেন, অমৃতকালের জন্য ভব্য ভারতের ভিতগড়া সম্ভব হবে, সেই দলকেই আমাদের জয়ী করতে হবে।

৪. প্রার্থী ঠিক করলাম, পছন্দের দলও ঠিক করলাম, চিন্তার সমন্বয় ঘটালাম, অথচ ভোট দিতে গেলাম না! ভাবলাম আমি ভোটাধিকার প্রয়োগ না করলেও ভোটের চলতি হাওয়ায় সে প্রার্থী, সে দল জিতে যাবে— তবে তা কিন্তু মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্ত হবে। সারা ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র রাজ্য যেখানে ভোটের সময় সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয়, রিগিং হয়, প্রভূত পরিমাণে ছাপ্পা ভোট দেওয়া হয়। সারা দেশের মধ্যে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই রক্তেরাঙা ভোট, বহু মানুষের মৃত্যু হয়। এটা এজন্যই সম্ভব হয়, সবমানুষ সপরিবারে ভোটে শামিল হন না, 'গণতন্ত্রের পূজা' করেন না। ভালোমানুষ যখন সঙ্ঘবদ্ধভাবে নীরব থাকেন, অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন না, তখনই পেশীশক্তি বুঝে যায়, তারা ফাঁকা মাঠ পেয়েছে, ভোট দুর্নীতি চালাতে পারবে। সবাই ভোটের ময়দানে না নামলে, সকাল সকাল নিজের নিজের ভোটটি দিতে না পারলে পছন্দের দল বা প্রার্থী কখনোই জিততে পারবেন না। আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার আপনাকেই প্রয়োগ করতে হবে। তবে গণতন্ত্রের জয় হবে, তবে গণতন্ত্রের পূজা সম্পন্ন হবে।

নোটা (NOTA বা None of the above)-তে ভোট দেওয়া একটি খারাপ প্রবণতা। তাতে নিজের ভোটটি হেলায় বিনষ্ট করা হয়। অনেকসময় অনেক রাজনৈতিক দল অন্য দুষ্ট দলকে জিতিয়ে দেবার জন্য নোটাতে ভোট প্রয়োগ করার জন্য পরোক্ষভাবে প্ররোচিত করে। অনেক নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় খুব সামান্য ভোটের ব্যবধানে উত্তম প্রার্থীরা পরাজিত হয়েছেন। সাধারণভাবে অভিজ্ঞতা এই নোটাতে ভোট মানেই অযোগ্য ও নিকৃষ্ট প্রার্থীর জিতে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে কষ্ট স্বীকার করছেন, অথচ নোটায় ভোট দিয়ে গণতন্ত্রের পক্ষে সদর্থকতা আনতে পারছেন না, তা কি গণতন্ত্রের পক্ষে সুখকর? এই নঞর্থক ভোট থেকে যথাসম্ভব বিরত হতে হবে এবং অন্যদেরও বিরত করতে হবে।

পরিশেষে বক্তব্যটি দাঁড়ালো এই, সেরা প্রার্থী ও সেরা দল বাছার প্রদত্ত সূত্রগুলি অনুসরণ করে সপরিবারে নিজের গণতান্ত্রিক মত উপস্থাপনা করবো, দেশকে বিকশিত করবো এবং পরম বৈভবশালী দেশ গঠনে নিজেদের শামিল করবো। ২০২৪-এর ভোট মানেই অমৃতকালের উন্নয়নমূলক সপ্তঋষিকে আনার ভোট; সার্বিক কল্যাণের জন্য সংহত কর্মকৌশল রচনার মতামত প্রয়োগ। □

ফঃ ৬

ভারতবিরোধীদের বিপক্ষেই ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে হবে

প্রতীক মুখার্জ্জী

ক্রমাগত বলে চললে একটি মিথ্যা নাকি সত্যি হয়ে যায়— এরকম একটি তত্ত্ব আছে বলে জানি। আর সেটির হাতেনাতে প্রমাণ পাই যখন দেখি ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের কুচক্রীদের উত্তরসূরীরা অর্ধসত্য ও মিথ্যা তথ্যের মাধ্যমে নিজেদের পূর্বজদের সমস্ত অপরাধ ঝেড়ে ফেলে নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করতে তৎপর হয়। উলটে সেইসময় যাঁরা ভারতবর্ষকে রক্ষা করার তাগিদে সেই অপশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁদেরই জনসাধারণের সম্মুখে অপরাধী হিসেবে খাড়া করার প্রবণতাও পরিলক্ষিত হয় সেই অপশক্তি ও তাদের এদেশীয় দোসরদের মধ্যে। আসলে সেদিন ভারতমাতার বীর সন্তানদের কারণে এই কুচক্রীরা তাদের ষড়যন্ত্রের অনেক পরিকল্পনাই জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হয়েছিল। সত্য ও ন্যায়ের সম্মুখে, জাতীয়তার নিকট অধর্মের সেই পরাজয় আজও তাদের তাড়া করে বেড়ায়। তাই নিজেদের বৃথা সান্ত্বনা দেওয়া এবং জনসাধারণকে ভুল বুঝিয়ে নিজেদের অপূর্ণ লক্ষ্যগুলি অন্যের ঘাড়ে ভর দিয়ে পূরণ করাই তাদের এই মিথ্যাচারের প্রধান উদ্দেশ্য।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, বঙ্গ-বিভাগ এবং হিন্দু হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গ গঠন নিয়ে তাদের মিথ্যাচারের কথা। পরাধীন ভারতবর্ষে যখন ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকামী আপামর জনসাধারণ তখন স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ না দিয়ে, ভারত ভেঙে নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র বাসভূমি গঠনের ডাক দিয়েছিল মুসলিম লিগ। সেই সাম্প্রদায়িক ঘৃণ্য চিন্তাধারার ধারক ও বাহকেরা এখন অর্ধসত্য ও মিথ্যা বচনের দ্বারা জনসাধারণকে বিশ্বাস করাতে উঠেপড়ে লেগেছে যে ভারত ভাঙার মূল কাণ্ডারি মুসলিম লিগ নেতারাই নাকি বঙ্গ ভাগের বিরুদ্ধে ছিল এবং কেন্দ্রে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, পশ্চিমবঙ্গে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-সহ সকল জাতীয়তাবাদী নেতা এবং আপামর বাঙ্গালি হিন্দু জনসাধারণ নাকি বঙ্গ ভাগের জন্য দায়ী! যারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ব্রিটিশের লাঠি, গুলি খেয়েছে, জেল খেটেছে, দ্বীপান্তরে গেছে, হাসিমুখে ফাঁসিতে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে তারাই স্বাধীনতা অর্জনের প্রাক্কালে হঠাৎ করে একটি প্রদেশকে দ্বিখণ্ডিত করেছে আর যারা আজীবন দেশবিরোধী কাজে লিপ্ত থেকেছে, ভারত ভাঙার স্বপ্নে বিভোর হয়েছে তারাই ভালোমানুষ হয়ে গিয়ে ভারতবর্ষের একটি প্রদেশ বিভাগের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে— এটি যে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অবাস্তব একথা তো কোনো তথ্যপ্রমাণ ছাড়া এককথাতেই বলে দেওয়া যায়।

আসলে লিগ নেতারা, বিশেষ করে 'অবিভক্ত বঙ্গ' প্রস্তাবের উত্থাপক ও পৃষ্ঠপোষক বাঙ্গলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দি, আবুল হাসিমেরা কখনোই ভারতের অধীনে অখণ্ড বঙ্গ চাননি। যদি সত্যিই লিগ নেতারা খণ্ডিত ভারতের বিপ্রতীপে ভারতের অধীনে অখণ্ড বঙ্গ চাইতেন তাহলে ১৯৪৭ সালের ২০ জুন অধিবেশনের শুরুতেই অখণ্ড বঙ্গের ভারতীয় ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব ১২৬-৯০ ভোটে খারিজ হতো না। তারা অখণ্ড বঙ্গের নামে সমগ্র বঙ্গকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন ও পরাধীন করতে চেয়েছিলেন। তাই তো যে

বাঙ্গালি ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল তারাই ১৯৪৭-এ বঙ্গকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে বঙ্গকে ভাগ করে পৃথক ও স্বতন্ত্র প্রদেশ পশ্চিমবঙ্গ গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল। আবার পাকিস্তান দাবির পাশাপাশি বঙ্গের লিগ নেতাদের যুক্তবঙ্গের দাবি আর তাতে তড়িঘড়ি জিন্নার সিলমোহর দেওয়া মুসলিম লিগের দ্বিচারিতাও নির্দেশ করে।

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে যারা দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশের বিভাজন চায়, ঘোষণা করে ভারতের মুসলমানরা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি জাতি, তাদের পক্ষে হিন্দুদের সঙ্গে বসবাস করা সম্ভব নয়, তারাই আবার ভারতবর্ষেরই একটি প্রদেশ বাঙ্গলার ক্ষেত্রে যেখানে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে তারা নিজেদের দাবি নিজেরাই প্রত্যাখ্যান করে জানায় হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই একটিমাত্র জাতি। তাই বাঙ্গলাকে ভাগ হতে দেওয়া চলবে না। তাই যুক্তবঙ্গের পক্ষে সওয়াল করার কারণে লিগ নেতাদের ও তাদের সহযোগীদের মহানুভব বলে প্রচার করা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। মহানুভব তাঁরাই যাঁরা অখণ্ড বঙ্গের নামে বৃহত্তর দেশভাগের চক্রান্তকে ব্যর্থ করে কলকাতা নগরী-সহ বাঙ্গলার একটি অংশকে ভারতের মধ্যে স্বাধীনভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-সহ জাতীয়তাবাদী নেতাদের বাঙ্গালি হিন্দুর বাসভূমি গঠনের জন্য আন্দোলন সম্পর্কে যে কুৎসা করা হয় তার মূল বক্তব্যে নতুনত্ব কিছু নেই।

বরং অখণ্ড বঙ্গের নামে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও স্বাধীন বঙ্গের নামে বাঙ্গলাকে পরাধীন করে রাখার চক্রান্ত ব্যর্থ হাতে যাচ্ছে দেখে আবুল হাসিমের মতো লিগ নেতারা এবং লিগ সমর্থিত পক্ষপাতদুষ্ট পত্রপত্রিকাগুলি পশ্চিমবঙ্গ গঠনের বিরুদ্ধে যে অবাস্তব ও অসত্য যুক্তিসমূহ উত্থাপন করেছিল সেগুলিই নব নব কলেবরে কুৎসাকারীদের মুখে শোভা পাচ্ছে মাত্র। তারা নিজেরা ব্যর্থ হচ্ছে দেখে হিন্দু সমাজের মধ্যে কৃত্রিম বিভেদ সৃষ্টি করে নিজেদের কার্যসিদ্ধি কারার অপপ্রয়াস বরাবরই চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ১৯৪৭-এ লিগের একজন হিন্দু নেতা ও মন্ত্রী যোগেন মণ্ডলকে সামনে রেখে মিথ্যা প্রচার

সেই সময় কতিপয় হিন্দু নেতা, যাঁরা লিগের দাবিমতো অখণ্ড বঙ্গকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রয়াস চালাচ্ছিলেন, তাঁদের তপশিলি বা বর্ণহিন্দু হিসেবে নয় বরং মুসলিম লিগের ক্রীড়নক হিসেবে পরিচয় দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

করা শুরু হয়েছিল যে তপশিলিরা বঙ্গ ভাগের বিরুদ্ধে। হিন্দু সমাজের মধ্যে আরও গভীর ভাবে কৃত্রিম ভেদাভেদ সৃষ্টির জন্য বলা হলো যে বঙ্গ ভাগ না হলে শাসন ক্ষমতা শুধুমাত্র মুসলমান ও তপশিলিদের হাতেই থাকবে। সেই জন্যই বর্ণহিন্দুরা ক্ষমতার লোভে বঙ্গ ভাগ করতে চাইছে। এভাবেই যোগেন মণ্ডলকে সামনে রেখে পুরো ফ্যাসিবাদী কায়দায় তপশিলি সমাজের মতামতকে উপেক্ষা করে নিজেদের মতামতকেই একটি সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য প্রস্তাবের রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল। বাস্তবে তপশিলি সমাজের বক্তব্যের সঙ্গে যোগেন মণ্ডলের মতের কোনো মিলই ছিল না।

১৯৪৭ সালের ১১ মে বঙ্গের প্রাক্তন তপশিলি মন্ত্রী প্রেমহরি বর্মন জানান, উত্তরবঙ্গের তপশিলিরা পশ্চিমবঙ্গ গঠনের পক্ষে। এছাড়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের নেতা ও গণপরিষদ সদস্য প্রমথরঞ্জন ঠাকুরও বাঙ্গালি হিন্দুর হোমল্যান্ড গঠনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন। অমৃতবাজার পত্রিকায় গ্যালপ পোলের ফলাফল প্রকাশিত হলেও দেখা যায় শতকরা ৯৮ শতাংশেরও বেশি মানুষ পশ্চিমবঙ্গ গঠনের পক্ষেই ভোট দিয়েছেন। সুতরাং হিন্দু সমাজের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টির জন্য লিগের বক্তব্য যে ভিত্তিহীন তা প্রমাণিত হয়েই গেল। তাই বাবাসাহেব আম্বেদকরের স্থানে যোগেন মণ্ডলকে বসিয়ে তাঁকে মহাপ্রাণ হিসেবে আখ্যায়িত করারও কোনো যুক্তি থাকতে পারে না। পরবর্তীকালে গোটা তপশিলি সমাজের বিরুদ্ধে যাওয়া যোগেন মণ্ডলের পরিণতি পাকিস্তানে কীরকম দুর্বিষহ হয়েছিল সেই ইতিহাস সকলেরই জানা। সেই সময় কতিপয় হিন্দু নেতা, যাঁরা লিগের দাবিমতো অখণ্ড বঙ্গকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রয়াস চালাচ্ছিলেন, তাঁদের তপশিলি বা বর্ণহিন্দু হিসেবে নয় বরং মুসলিম লিগের ক্রীড়নক হিসেবে পরিচয় দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। কেননা সেই সমস্ত নেতার মধ্যে যেমন যোগেন মণ্ডল ছিলেন, তেমনই ছিলেন বঙ্গ সরকারের মন্ত্রী তারকনাথ মুখোপাধ্যায়।

এঁদের কারুরই বক্তব্য সমগ্র তপশিলি বা বর্ণহিন্দু সমাজের মনের ভাবের প্রতিফলন নয়, বরং তা হিন্দুসমাজের মতামতকে উপেক্ষা করে নিজ স্বার্থ সুরক্ষার দিকটিই নির্দেশ করে। যেহেতু ছোটোবেলা থেকেই বিদ্যালয়ে ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে সেই সময়ের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, অখণ্ড বঙ্গের ষড়যন্ত্র বিষয়ে স্পষ্টভাবে প্রায় কিছুরই উল্লেখ থাকেনি তাই যখনই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে যোগেন মণ্ডলকে মহাপ্রাণ, বাঙ্গলার আম্বেদকর ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করা হয়, ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে কুৎসা করা হয়, তখন আমরা সত্য-মিথ্যার ফারাক বুঝতে না পেরে বিভ্রান্ত হয়ে দুষ্টের পাতা ফাঁদে জড়িয়ে যাই। আমাদের নিজে ইতিহাস ঘেঁটে সত্যানুসন্ধান করতে হবে। বুঝতে হবে সেই সময় বঙ্গের আপামর জনসাধারণের কণ্ঠ ছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গ গঠনের সিদ্ধান্ত আসলে বাঙ্গলার আপামর জনতার আন্তরিক ইচ্ছাকেই বাস্তবে রূপদান করেছিল। তাঁদের সিদ্ধান্তই ছিল ন্যায়ের পক্ষে, স্বদেশের হিতে। যেদিন আমরা সকলে এই সত্যকে উপলব্ধি করবো সেদিন ব্যর্থ হবে মুসলিম লিগের উত্তরসূরীরা। বোঝা যাবে পশ্চিমবঙ্গ গঠনের বিরোধীরা প্রকৃতপক্ষে ভারতবিরোধী। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে এই ভারতবিরোধীদের বীভৎস কীর্তিকলাপ মনে রেখেই ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে হবে বাঙ্গালিকে। □

বিচারধারা প্রতিষ্ঠার দশ বছর

ড. জিষ্ণু বসু

ভারতবর্ষ পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ। ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে ৫৫ কোটি ৩৮ লক্ষ মানুষ ভোট দেন, ২০১৯ সালে ৬১ কোটি ১০ লক্ষের বেশি মানুষ ভোট দিয়েছিলেন। তাই এই বিশাল ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য তো দেশের মানুষের জীবনযাপন ভালো থাকাকে নিশ্চিত করা। দেশের দরিদ্রতম মানুষটিও যাতে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা পান তার জন্যই তো এই গণতন্ত্র।

জীবন ধারণের জন্য যে উপাদান প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করবে সরকার। এই প্রত্যাশা থেকে মানুষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন স্তরে ভোট দেন। গ্রামের কৃষি, সেচ, স্বাস্থ্য, সুরক্ষা থেকে মানুষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন স্তরে ভোট দেন। গ্রামের কৃষি, সেচ, স্বাস্থ্য, সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেন ভোটাররা। রাজ্যের সুশাসন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সুশিক্ষা ও সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য পরিষেবা পেতে মানুষ রাজ্য সরকার নির্বাচিত করেন। কিন্তু লোকসভা নির্বাচন বা দেশের সাধারণ নির্বাচনে ভোট দেবার সময় কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে উপরের সবকটি বিষয় তো প্রত্যাশা করেনই, সেই সঙ্গে আরও একটি বিষয় আশা করেন, সেটি হলো বিচারধারা আর দেশের গৌরব।

আমার দেশ পৃথিবীর মানুষের সামনে কেমন হবে সেটা আমার দেশের সরকার ঠিক করবে। সেই দেশটি চীনের মতো নিষ্ঠুর একনায়কতান্ত্রিক দেশ হবে নাকি পাকিস্তারে মতো ব্যর্থ দেশ বা ফেইল্ড স্টেট হবে? নাকি শ্রীলঙ্কার মতো দেউলিয়া দেশ হবে সেটি ঠিক হয় দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের সাফল্যের উপর।

১৯৬২ সালে চীনের কাছে ভারতের পরাজয়, ১৯৮৫ সালে শাহবানু মামলায় ভারত সরকারের নির্দয় আচরণ বা ২০০৮ সালে ২৬ নভেম্বর মুম্বই শহরে লস্কর-ই-তৈবার আক্রমণ জগৎসভায় ভারতের ভাবমূর্তিকে ছোটো করে দিয়েছিল।

১৫২৮ সালে উজবেকিস্তান থেকে আসা আক্রমণকারী মুঘল বাদশা অযোধ্যায় শত শত বছরের পুরাতন রামলালার মন্দির ভাঙার নির্দেশ দিয়েছিল। বাবরের সেনাপতি মীরবাকি সেই প্রসিদ্ধ মন্দির ভেঙে সেখানে মসজিদ বানিয়ে ছিল। গোস্বামী তুলসীদাসের বয়স তখন ১৭ বছর। তাঁর নিজের ভূমিতেই নিজের সমাজের পরমারাধ্য দেবতার মন্দির ধ্বংস করে দিল বিদেশি আক্রমণকারীরা।

তুলসীদাস অযোধ্যা থেকে কাশীতে গিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করেন। হর-পার্বতী তাঁকে সাধারণ মানুষের ভাষা অওধিতে শ্রীরামের কথা 'রামচরিত মানস' লিখতে বলেন। বিগত পাঁচশো বছর ধরে ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষ সেই রামচরিত মানস ও 'হনুমান চল্লিশা' পাঠ করেছেন আর শপথ নিয়েছেন। তুলসীদাস এক জনআন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন। তাই মুঘল বাদশা আকবর তাঁকে ফতেপুর সিক্রির কারাগারে বন্দি করেছিল।

ভারতের নবজাগরণের কেন্দ্রে ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব আন্দোলন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পিতৃদেব ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় জমিদারের হয়ে মিথ্যে সাক্ষী দিতে অস্বীকার করেন। তাঁকে ভিটেমাটি, সম্পত্তি ছেড়ে কামারপুকুরে আসতে হয়। সেই সময় ক্ষুদিরাম কেবল কুলদেবতা রঘুনাথকে সঙ্গে এনেছিলেন। অনেক পরে উত্তর ভারতে থেকে আসা সন্ন্যাসী জটাধারী দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রামলালাকে নিয়ে এসেছিলেন। রামলালার চিন্ময় মূর্তি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে ছোটো বালকের মতো লীলা করতেন।

তাই ভারতের প্রতিটি জাগরণের সঙ্গে ছিল রামলালার আশীর্বাদ। আজ ২০২৪ সালে এত বছর পরে অযোধ্যায় ভগবান রামলালার মন্দির নির্মিত হলো। জনজাগরণ, আদালতের রায় এইসবের সঙ্গে প্রয়োজন ছিল এক দৃঢ়চেতা

অযোধ্যার পুনর্নির্মিত রামমন্দিরে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

অমানবিক 'তিন তালাক' প্রথাকে বেআইনি ঘোষণা।

কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারার বিলুপ্তি ঘটানো।

দেশজুড়ে সিএএ (সিটিজেনশিপ অ্যামেনমেন্ট বিল) প্রয়োগ করা।

রাষ্ট্রনেতৃত্ব। দেশের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের আদর্শনিষ্ঠার জন্যই পাঁচশো বছরের পরাধীনতার থেকে মুক্তি সম্ভব হয়েছে। ২০২৪ সালের ২২ জানুয়ারি অযোধ্যার পুনর্নির্মিত রামমন্দিরে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে।

২০১৭ সালেই ভারতের মহামান্য সর্বোচ্চ আদালত অমানবিক 'তিন-তালাক'কে বেআইনি ঘোষণা করেন। আজকের কেন্দ্রীয় সরকার একদেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পথে অগ্রসর হচ্ছে। একটি উন্নত দেশের সব মানুষের জন্য দেশের সরকার উন্নয়নের পরিকল্পনা করতে পারবে। আর একজন শাহবানু নীরবে কাঁদবেন না।

তাই অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সঙ্গে ভাবতে হবে যে, কেন্দ্রে এমন সরকার যেন আসে যারা ভারতবর্ষের আবহমানকালের ঐতিহ্যকে যেন বহন করে নিয়ে চলে। নেতাজী সুভাষের মতো দেশপ্রেমিকরা যেন তাঁদের মরণপণ সংগ্রামের যোগ্য সম্মান পান। জাতীয় শিক্ষা নীতিতে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনা রূপায়িত হয়। এবারের লোকসভা ভোট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন নেওয়ার দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। আজ পৃথিবীর পঞ্চম অর্থনীতি, কোভিড ভ্যাকসিনের, পররাষ্ট্র নীতির মতো প্রতিক্ষেত্রে ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে সমগ্র পৃথিবী। এর জন্য প্রয়োজন দেশভক্ত, আদর্শনিষ্ঠ নেতৃত্ব। যে বিচারধারার চর্চা করে বহু মানুষ সন্ন্যাসীর মতো জীবনের সব কিছু ত্যাগ করেছেন, তাঁদের স্বপ্ন আজ সার্থক হওয়ার পথে।

এতকাল মানুষ কেবল অঙ্গীকার শুনেছে। গত দশ বছরে দেশবাসী তাদের আদর্শ, ভাবাবেগ ও বিচারধারার অঙ্গীকারগুলি সচক্ষে বাস্তবায়িত হতে দেখেছেন। আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় মনীষীরা যে ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিলেন, গত দশ বছরে একটু একটু করে সেই বিচারধারার পূজাবেদী সাজিয়েছে একটি রাষ্ট্রবাদী সরকার। ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচন সেই পূজা সম্পূর্ণ করার পরীক্ষা।১৯৫৩ সালে কাশ্মীরে প্রবেশ করার সময় উধমপুরে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে। তাঁর দাবি ছিল স্বাধীন ভারতের প্রতিটি রাজ্যে একই আইন চলবে। এক দেশে এক আইন, এক পতাকা ও একজন প্রধান হবেন। সেদিন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হওয়ার সময় সঙ্গে ছিলেন তরুণ সাংবাদিক অটলবিহারী বাজপেয়ী।

এত বছর ভারতবর্ষ জুড়ে সেই বেদনাদায়ক ঘটনার কথা মানুষ স্মরণ করেছে। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে শ্রীনগর থেকে দূরে একটি অস্বাস্থ্যকর জায়গাতে বন্দি করে প্রকারান্তরে হত্যা করা হয়েছিল। সেই বলিদানকে স্মরণ করে এতকাল ভারতের প্রতিপ্রান্তে মানুষ বলতেন, 'যাহা হুয়েঁ' বলিদান মুখার্জ্জী, উও কাশ্মীর হামারা হ্যায়। কিন্তু যে পারমিট না নিয়ে যাওয়ার জন্য ১৯৫৩ সালে জেলের ভেতর স্বাধীন ভারতের কাশ্মীরে দেশের প্রথম শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রীকে হত্যা করা হয়েছিল তার মূলে ছিল সংবিধানের ৩৭০ ধারা। যার বলে কাশ্মীর বিশেষ অধিকার পেত।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সৃষ্ট দল আজ কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতায়। এতদিন পরেও তাঁরা তাদের বিচারধারাকে ভুলে যায়নি। ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট ভারতের সংসদে সবকটি কক্ষের ভোটে বাতিল হয়ে গেল সংবিধানের ৩৭০ ধারা। কাশ্মীরের মানুষ আজ ভারতবর্ষের সমান নাগরিকত্ব ও সংবিধানিক অধিকার পেলেন। এত বছরের শাপ মোচন হলো কাশ্মীরের। ২০১৯ সালের পরে এই পাঁচ বছরে সারাদিন ধরে পাথর ছোঁড়া বন্ধ হয়েছে। ভূস্বর্গ কাশ্মীর আজ আবার সারা পৃথিবীর পর্যটকদের প্রথম পছন্দ। হাজার বছরের পুরাতন সারদাপীঠে হচ্ছে পূজার্চনা। কাশ্মীরের মুসলমান মেয়ে বিশ্বসভায় গিয়ে বলছেন যে তাঁকে মালালার মতো বিদেশে পালাতে হবে না, তিনি ভারতীয় ছিলেন, আছেন ও থাকবেন। □

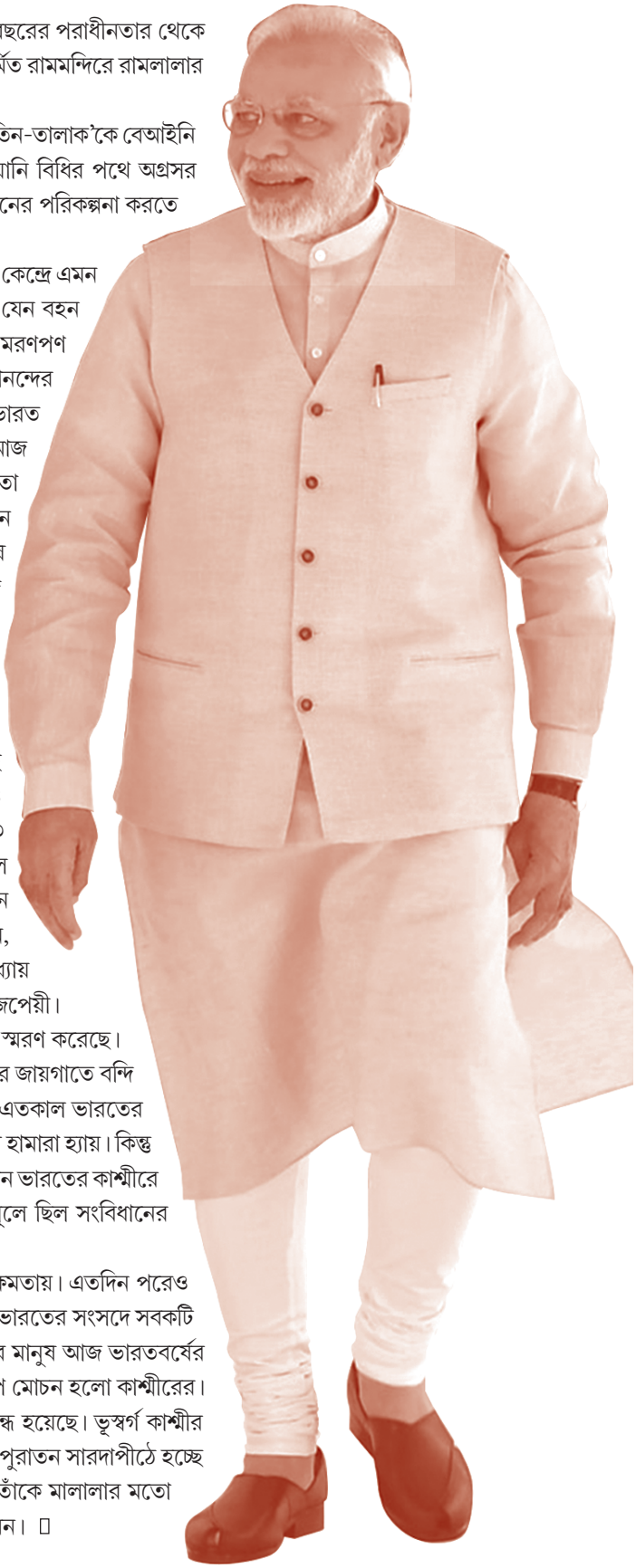

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গবাসীর কর্তব্য

ড. রামানুজ গোস্বামী

লোকসভা নির্বাচনের দামামা বেজে গিয়েছে। যদিও নির্বাচনের দিনক্ষণ আনুষ্ঠানিক ভাবে এখনও ঘোষণা করা হয়নি, (এই প্রবন্ধটি লেখার সময় পর্যন্ত) কিন্তু শাসক-বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দলই কোমর বেঁধে ময়দানে নেমে পড়েছে। কেন্দ্রের শাসক বিজেপিকে হারাতে তৃণমূল-সহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি একেবারে বদ্ধপরিকর। কিন্তু তাদের সেই স্বপ্ন একেবারে বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়ার মতোই; কারণ লোকসভা নির্বাচনের রণাঙ্গণে বিরোধী দলগুলিকে সহস্র যোজন পিছনে ফেলে বিপুল সংখ্যক আসনে বিজেপির জয়লাভ করা এখন মাত্র সময়ের অপেক্ষা। মোদীময় ভারতে আজ যে তুমুল গেরুয়া ঝড় উঠতে চলেছে, তার মোকাবিলা করার ক্ষমতা কোনও বিরোধী দলেরই নেই। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য এক অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য অপেক্ষা করে রয়েছে।

সম্প্রতি তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গের ৪২টি লোকসভা আসনেই তাদের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে। খুব স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত ভাবেই দিল্লি বনাম পশ্চিমবঙ্গ— এই প্রসঙ্গটি তৃণমূল আবারও সামনে নিয়ে এসেছে এবং এই অস্ত্রে শান দিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে চাইছে। আসলে দুর্নীতিতে আকণ্ঠনিমজ্জিত এবং দুর্বৃত্তদের দ্বারা পরিচালিত তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত অস্ত্রই ভোঁতা হয়ে গিয়েছে; এমনকী খোদ মমতা ব্যানার্জীর নিজের জনপ্রিয়তাও যথেষ্টই কমে গিয়েছে। পাশাপাশি এটা তো ঠিকই যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিগত বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন নন্দীগ্রামে। এই সকল নানা কারণে তৃণমূল আজ স্পষ্টতই ভীত। এই কারণেই দিল্লি হলো পশ্চিমবঙ্গের শত্রু, দিল্লি পশ্চিমবঙ্গকে অপমান করে চলে, দিল্লি বঙ্গের সংস্কৃতিকে বিধ্বস্ত করতে চাইছে ইত্যাদি চটুল ও মেঠো কথা বলে এবং আবেগপ্রবণ বাঙ্গালিকে উসকে দিয়ে কোনওমতে ভোটে জেতার চেষ্টা করে চলেছে তৃণমূল। তলায় তলায় নিজেদের আখের গোছানোর জন্য তৃণমূলের সঙ্গী হয়েছে বাম ও কংগ্রেস, তবে প্রকাশ্যে সেকথা কখনই স্বীকার করে না এই দলগুলি। এরা বিভিন্ন সময়ে গোপনে তৃণমূলকে ভোট দিয়ে বা ভোট কাটার কাজ করে বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূলের সুবিধাই করে দিয়েছে এবং এবারও দেবে। তাই পশ্চিমবঙ্গের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ভোটারদের এবারের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে বাম ও কংগ্রেসকে একেবারেই নির্মূল করে ফেলতে হবে। এবং তৃণমূল শাসনের অবসান ঘটাতে হবে।

তৃণমূল কংগ্রেস প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে এটা উপলব্ধি করতেই হবে যে, বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের মাটি থেকে যদি তৃণমূলকে একেবারে মূল থেকেই উৎপাটিত না করা হয়, তবে পরিণতি হবে এত ভয়াবহ যে তা বোধহয় ভাষায় প্রকাশ করাও সম্ভব নয়। তৃণমূল হলো একটি আদ্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত, দুর্বৃত্ত প্রতিপালনকারী এবং দেশবিরোধী মনোভাব নিয়ে কাজ করা দল, যারা হিন্দুবিরোধী মানসিকতার জন্যও সুপ্রসিদ্ধ। যদিও পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ মিডিয়াই তৃণমূলের জয়গানে ব্যস্ত থাকে, তথাপি কিছু নিরপেক্ষ এবং সৎ মিডিয়া আজও গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবেই কাজ করে চলেছে। এই সব নির্ভীক গণমাধ্যম ও বিভিন্ন সর্বভারতীয় মিডিয়ার দ্বারা আজ পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক চিত্রটা ভারত তথা সারা বিশ্বের মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। মনে রাখা দরকার যে, এটা হলো সামাজিক মাধ্যমের যুগ যাতে খবর চাপা থাকে না। তাই বিভিন্ন সময়ে তৃণমূলের নানাবিধ অপকীর্তির কাহিনি আজ সারা পৃথিবীর মানুষ জেনে গিয়েছে। এই তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন সন্দেশখালির সন্ত্রাসের ঘৃণ্য অধ্যায়। সভ্য মানবসমাজের বাইরে অসভ্য, বর্বর জঙ্গিদের শাসনের রাজত্বেই এমনটা ঘটা সম্ভব।

২০২৪-এর লোকসভা ভোটে যদি তৃণমূলকে পর্যুদস্ত করা যায়, তবে নিশ্চিত ভাবেই ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটে তৃণমূল একেবারেই দুর্বল হয়ে পড়বে, একথা জোর দিয়েই বলা যায়। মনে রাখা দরকার যে, একমাত্র ডবল ইঞ্জিন সরকারই পারে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, পরিকাঠামোর উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আলোর পথ দেখাতে। পশ্চিমবঙ্গ আজ খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে। এরপরেও যদি তৃণমূল নামক একটি দল এই রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় থাকে তবে একথাই বুঝতে হবে যে, অপসংস্কৃতি, অনুন্নয়ন, সস্তায় লব্ধ ভাতা এবং এই ঘৃণ্য মেঠো রাজনীতিই বর্তমান বাঙ্গালিদের ভবিতব্য এবং বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গ খাদের অতলে তলিয়ে যাবে। তাই তৃণমূলের মিথ্যা প্রচার আর মেকি বাঙ্গালিয়ানায় না ভুলে আজ নিজেদের স্বার্থে, পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে সবাইকে একজোট হয়ে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে রাষ্ট্রবাদী দলকে বিপুল সংখ্যক আসনে জয়যুক্ত করতে হবে। তবেই বাঁচবে পশ্চিমবঙ্গ, বাঁচবে বাঙ্গালি।

সন্দেশখালি একটি সুবিশাল হিমশৈলের চূড়ামাত্র। গোটা পশ্চিমবঙ্গের ছবিটা একই। এই রাজ্যে নেই কোনও আইনের শাসন। নামেই পশ্চিমবঙ্গ ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য। ভারতীয় আইন এখানে অচল। বস্তুত দলমত নির্বিশেষে এরকম দলদাস পুলিশ ও প্রশাসন ভারতের আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। বেআইনি অনুপ্রবেশ, রোহিঙ্গাদের জন্য সুসংহত ও নিরাপদ আশ্রয়, ইসলামিক জঙ্গিদের সর্বাপেক্ষা নিরাপদ আস্তানা, নারী ও শিশু পাচার, নারী নির্যাতন সর্বস্তরে চুরি ইত্যাদিতে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের মধ্যে শীর্ষস্থানে। সৌজন্যে তৃণমূল শাসক সরকার। ভারত সরকারের বিভিন্ন এজেন্সিকে এই রাজ্যে স্বাধীন ভাবে তদন্ত করতে সবরকম ভাবে বাধা দেওয়া হয়। বিএসএফ যাতে তাদের কাজ ঠিকমতো করতে না পারে, তার জন্যও শাসকদল সদাসর্বদাই তৎপর। পশ্চিমবঙ্গের বদলে যাওয়া জনবিন্যাস, বিভিন্ন সীমান্তবর্তী এলাকায় হিন্দুদের উপরে ক্রমাগত ঘটে চলা অত্যাচার এবং ধীরে ধীরে পশ্চিমবঙ্গকে একটি মুসলমান অধ্যুষিত রাজ্যে পরিণত হওয়া ঠেকাতে আজ এই রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সমস্ত মানুষকেই একজোট হতে হবে। সারা ভারত আজ মোদীজীর সঙ্গে রয়েছে। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম সর্বত্র ভারতীয়রা আজ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন প্রধানমন্ত্রী পদে নরেন্দ্র মোদীর তৃতীয়বার শপথ গ্রহণের জন্য। ভারতের বাইরেও বিভিন্ন দেশের ভারতীয়দের ক্ষেত্রেও একই প্রথা প্রযোজ্য। ভারত আজ সমগ্র বিশ্বকেও পথ দেখাচ্ছে। ঠিক এই কারণেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী আজ পৃথিবীর জনপ্রিয়তম রাষ্ট্রনায়ক। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে ইউরোপ বা আমেরিকা নয়, ভারতই হয়ে চলেছে বিশ্বকে নেতৃত্ব প্রদানকারী দেশ। পশ্চিমবঙ্গকেও এই মহান কর্মযজ্ঞে শামিল হতেই হবে।

মনে রাখতে হবে যে, বিজেপি সরকার মোটেও বাঙ্গালিবিরোধী নয়। পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার সবরকম সহযোগিতা করেছে, করছে ও করবে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়ে যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। সম্প্রতি বেশ কয়েকবার তিনি পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন এবং উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ মিলিয়ে বেশ কয়েকটি জনসভাও করেছেন। বারে বারে তাঁর বক্তব্যে যে সহজ সত্য উঠে এসেছে তা হলো, রাজ্যের তৃণমূল সরকারের অসহযোগিতা ও দুর্নীতির কারণেই নানাবিধ প্রকল্প এই রাজ্যে চালু করা সম্ভব হয়নি অথবা দেরিতে চালু হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কল্যাণীর এইমস্ হাসপাতালের কথা তো বলা যেতেই পারে। আসলে, তৃণমূল শাসনে পশ্চিমবঙ্গ একটি পিছিয়ে পড়া রাজ্য ছাড়া আর কিছুই নয় যা এক অপশাসনের মধ্যে দিয়ে চলেছে। আর এই অপশাসনের অবসান ঘটাতেই হবে।

আমরা এই প্রবন্ধের একেবারে অন্তিম পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি লোকসভা আসনে তৃণমূলের বিরুদ্ধে রাজ্যের বিবেকবান ভোটারদের একজোট হতেই হবে। বাঙ্গালি সংস্কৃতি ও হিন্দুত্বকে বাঁচাতে, রাজ্যে তথা দেশের সুরক্ষাকে মজবুত করতে, সমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গ গড়ে তুলতে, নারীর মর্যাদা রক্ষা করতে তৃণমূল শাসনের অবসান ঘটাতেই হবে। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন তারই ভিত্তি প্রস্তুত করবে। এ এক অগ্নিপরীক্ষা পশ্চিমবঙ্গের। □

সফল হলো অগ্নি-৫-এর উৎক্ষেপণ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি অগ্নি-৫ ক্ষেপণাস্ত্রের উৎক্ষেপণ সফল হলো। গত ১১ মার্চ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই সফল উৎক্ষেপণের খবর দেশবাসীকে জানিয়েছেন। তিনি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ডিআরডিও-র বিজ্ঞানীদেরও।

ভারতের 'মিশন দিব্যাস্ত্র' প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত অগ্নি-৫ ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ। পরমাণুঅস্ত্র বহনে সক্ষম এই ক্ষেপণাস্ত্রটি হলো— 'এমআইআরভি- কেপেবল্ ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল'।

ক্ষেপণাস্ত্রটির পাল্লা ৭ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি। এটি একটি থ্রি-স্টেজ (ত্রিস্তর বিশিষ্ট), রোড-মোবাইল, ক্যানিস্টারাইজড্, সলিড-ফুয়েলড্ ব্যালিস্টিক মিসাইল। ভারতীয় প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে অগ্নি-৫-এর সংযোজন আইসিবিএম (ইন্টার-কন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল) নির্মাণ ও সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিগত নিরিখে আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আমেরিকা ও রাশিয়ার পর তৃতীয় স্থানে উন্নীত করল ভারতকে।

দেশ জুড়ে কার্যকর নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন, ২০১৯

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ২০১৯ সালের ৯ ডিসেম্বর 'দ্য সিটিজেনশিপ (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল' বা নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল পাশ হয় লোকসভায়। ১১ ডিসেম্বর রাজ্যসভায় এই বিলটি পাশ হয়। এরপর ১২ ডিসেম্বর ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ বিলটিতে অনুমোদন দেওয়ার পর সেটি 'দ্য সিটিজেনশিপ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট' বা সিএএ আইনে পরিণত হয়। 'দ্য সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট, ১৯৫৫' বা ভারতীয় নাগরিকত্ব আইনের ২ নং ধারাটিতে সিএএর-র দ্বারা সংশোধনীর মাধ্যমে ২(১)(খ) ধারাটি সংযোজিত হয়েছে। এই আইনের ফলে প্রতিবেশী তিনটি দেশ— পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে ধর্মীয় নির্যাতন ও শোষণের শিকার হয়ে ভারতে আসা এই দেশগুলির সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, অর্থাৎ হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্শি ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা ভারতের নাগরিকত্ব পাবেন। ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতে আশ্রয় নেওয়া এই দেশগুলির ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে।

ধর্মের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের দেশভাগ এবং তার ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানে (পরবর্তীকালে বাংলাদেশে) যে বীভৎস, নারকীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন ভারতীয় জীবন পদ্ধতির অনুসারীদের হতে হয় তার প্রতিবাদে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার শুরুর দিন থেকেই সোচ্চার ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। এই দেশগুলি হতে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করা শরণার্থী, উদ্বাস্তু জনতার ন্যায্য দাবি প্রতিধ্বনিত হয়েছে তাদের প্রতিটি রাজনৈতিক সংকল্পপত্রে। কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব লাভ করলে শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল বর্তমানে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন এই রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক দলটি। এই দেশগুলি হতে আগত উদ্বাস্তুদের ভারতীয় সংবিধান প্রদত্ত যাবতীয় অধিকারদানের লক্ষ্যে তাদের নাগরিকত্বদান এবং এই নাগরিকত্বদানের মাধ্যমে তাদের সাংবিধানিক অধিকার সুনিশ্চিত করা ছিল এই আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য। এই আইন নাগরিকত্ব দেওয়ার আইন, নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার নয়। সংকল্পপত্রের প্রতিটি প্রতিশ্রুতি রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিজেপি এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বর্তমান এনডিএ সরকার তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করল। গত ১১ মার্চ দেশ জুড়ে চালু হয়ে গেল সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বা সিএএ। ১১ মার্চ সন্ধ্যায় বিজ্ঞপ্তি জারি করে আনুষ্ঠানিক ভাবে সিএএ কার্যকর হওয়ার কথা জানিয়েছে কেন্দ্র।

সিএএ আইনটি প্রয়োগের উদ্দেশ্যে এই আইনের বিধি বা 'দ্য সিটিজেনশিপ (অ্যামেন্ডমেন্ট) রুলস্, ২০২৪'-এর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। গত ফেব্রুয়ারিতে দিল্লিতে একটি বাণিজ্য সম্মেলনে যোগ দিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বলেছিলেন, 'সংসদে প্রণীত সিএএ দেশের একটি আইন। লোকসভা নির্বাচনের আগে তা অবশ্যই কার্যকর হবে। এ বিষয়ে কোনো সংশয় থাকাই উচিত নয়। নাগরিকত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে দেশের মানুষের সঙ্গে কংগ্রেস বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কোনো ভারতীয় নাগরিকের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার জন্য এই আইন আনা হয়নি। এই আইন নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য তৈরি হয়েছে'। সিএএ বিজ্ঞপ্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব-সহ বাংলাদেশ থেকে ধর্মীয় কারণে উৎখাত হয়ে এদেশে বসবাসরত বাঙ্গালি উদ্বাস্তুরা। □

সন্দেশখালির প্রতিবাদী মায়েদের অভিনন্দন জানালো রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি, আশ্বাস দিল পাশে থাকার

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সন্দেশখালির আক্রান্ত এলাকায় গিয়ে প্রতিবাদী মায়েদের অভিনন্দন জানালো রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি। রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির অখিল ভারতীয় সহ-কার্যবাহিকা সুনীতা হলদেকর-সহ পশ্চিমবঙ্গের ছয় সদস্যের প্রতিনিধি দল গত ৭ মার্চ সন্দেশখালি পৌঁছয়। সেখানে মাঝেরপাড়া গ্রামের আক্রান্ত মহিলাদের সঙ্গে তাঁরা কথা বলেন। এদিন সেবিকা সমিতির প্রতিনিধিরা তাঁদের সর্বদা সংগঠিত থাকার পরামর্শ দিয়ে তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। রাজ্যে একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর শাসনকালে দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে আক্রান্ত- অত্যাচারিত হওয়ার পর গত ফেব্রুয়ারি মাসে সন্দেশখালির জনরোষের বহিঃপ্রকাশ দেখেছে রাজ্য তথা সমগ্র দেশ। আজ আন্দোলনের সেই উৎসস্থলে গিয়ে স্থানীয় মানুষের বর্তমান অবস্থার খোঁজ নিলো রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি। সুনীতা হলদেকরের নেতৃত্বে সেবিকা সমিতির ছয় সদস্যের প্রতিনিধি দল সন্দেশখালি পৌঁছে মাঝেরপাড়া গ্রামের মহিলাদের সঙ্গে মিলিত হন। তাঁরা স্থানীয় মহিলাদের সুসংগঠিত প্রতিবাদের জন্য তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানান। মন দিয়ে শোনেন দুষ্কৃতীদের সন্ত্রাস এবং মহিলাদের অত্যাচারিত হওয়ার বিবরণ। সন্দেশখালির প্রতিবাদী মহিলারা বলেন, শেখ শাজাহান, উত্তম সর্দার, শিবু হাজরারা গ্রেফতার হলেও এলাকায় এখনও ভয়ের পরিবেশ রয়েছে। এখনও বিভিন্ন জনকে ফোন করে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তাঁরা মেয়েদের উপযুক্ত নিরাপত্তা ও এলাকায় শান্তির দাবি জানান।

সেবিকা সমিতির অখিল ভারতীয় সহ-কার্যবাহিকা সুনীতা হলদেকর বলেন, সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি আগেই তৎপর হয়েছে। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের কাশীতে অনুষ্ঠিত সেবিকা সমিতির অখিল ভারতীয় বৈঠকে সন্দেশখালির ঘটনায় নিন্দা প্রস্তাব আনা হয়েছে। তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে সমিতির পক্ষ থেকে পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রেখে নির্যাতিতা মহিলাদের সর্বদা সংগঠিত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়। সমিতির মূল লক্ষ্য অনুযায়ী তাঁদের মানসিক ও শারীরিকভাবে আত্মবিশ্বাসী রাখার এবং তাঁদের মনের জোর বৃদ্ধির বিষয়টিই প্রাথমিকভাবে স্থির হয়েছে, যার প্রমাণ সন্দেশখালির মহিলারা আগেই দিয়েছেন। তবে তাঁদের এই দৃঢ়চেতা মানসিকতা এবং যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর অনমনীয় মনোভাব যাতে সর্বদা বজায় থাকে তার জন্য সেবিকা সমিতি লাগাতার তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবে। সেই সঙ্গে চাষের জমিতে শাজাহান বাহিনী নোনাজল ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য আগামী তিন বছরের জন্য জমি আর চাষযোগ্য না থাকায় এলাকার মহিলারা কীভাবে কিছুটা স্বাবলম্বী ও স্বনির্ভর হতে পারেন সেবিষয়েও চিন্তাভাবনা চলছে সেবিকা সমিতির পক্ষ থেকে। ওই দিন মাঝেরপাড়ায় সেবিকা সমিতির প্রতিনিধিদের দেখা হয় কৃষিজমিতে নোনাজল ঢুকিয়ে দেওয়া নিয়ে আক্ষেপ করে ভাইরাল হওয়া গ্রাম্য নায়ক এক খুদের সঙ্গে। তাঁরা অতটুকু শিশুর অনুভবকে সম্মান জানান। ভবিষ্যতে ভালো মানুষ হিসেবে তৈরি হওয়ার জন্য তাকে তাঁরা আশীর্বাদ করেন। □